চপলার প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসার পরিচয় প্রদান করি।

"চপলার অশেষ গুণরাশির পরিচয় প্রদান করা সাধ্যাতীত হইলেও কিছু প্রকাশ করিয়া হৃদয়-বেদনা লাঘব করিব, ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাহাও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিতে পারিলাম না—কারণ তাহার অশেষ গুণের পরিচয় ক্ষুদ্র লেখনীর মুখে প্রকাশ করিতে আমি মনের দারুণ আবেগে ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না। আমি ভগবানের নিকট তাহার নির্ম্মল পবিত্র আত্মার মঙ্গল প্রার্থনা করি। ...

চপলা নানাগুণে ভূষিতা ছিল, তজ্জন্য সকলের প্রিয় ছিল। সংসারের কোন দুঃখ কষ্ট না পেয়ে হেসে হেসে চলে' গেল—ইহাই ভেবে আমাদের মনস্থির করিতে হইবে ... (৩রা ডিসেম্বর ১৯০৮)"*

শ্রীযুক্তা সরোজবালা দত্ত লিখেছেন :—"স্বর্গত প্রিয়তম চপলাবালা গুহের অলৌকিক প্রতিভা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিবার ইচ্ছায় ক্ষুদ্র লেখনী হাতে নিয়ে বসেছি। এই ক্ষুদ্র তুচ্ছতম হেয় লেখনীমুখে তা'র প্রতিভারাশি প্রকাশ করা এবং এমন গৌরবান্বিত পূত জীবনের আলোচনায় সাহস করা, তার পবিত্র জীবনের উপর ছায়াপাত করা হয় বলিয়া ভীত।....

"আমাদের মহিলা-সম্মিলনী চপলাবালার একতম প্রধান প্রিয় দ্রব্য ছিল, তা'রি উৎসাহে, তা'রি প্রাণপণ যত্নে, তা'রি উদ্দীপনায়, তা'রি উদ্যোগে এই মহিলা-সম্মিলনী প্রতিষ্ঠিত। হায়, এত শীঘ্র চপলার প্রিয় সম্মিলনী চপলা-হারা হ'য়ে গেল।

"চপলাই সম্মিলনীর 'শিব' ছিল। মহিলারা তা'কেই আদর্শ রাখিয়া তারি কথায় চলিত। তারি উৎসাহপূর্ণ বাণীতে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় জাগ্রত হ'ত। আমরা যে সঞ্জীবনী আশালতা সম্মুখে রেখে' অগ্রসর হইতাম—বিধাতা তাহার রুদ্র রবিকরস্পর্শে আমাদের সেই মৃতসঞ্জীবনী আশালতা সমূলে জীবনহীন করিয়া দিলেন। সম্মিলনী আজ মৃতকল্পের ন্যায়। আমরা আজ জীবনহীনের ন্যায় অসার ও অচল হইয়াছি। হায়, তা'র প্রতিভা শতমুখেও বলিবার নহে—শতকণ্ঠেও তা'র গুণগীতি গাহিবার নহে।

"সম্মিলনীর প্রতি অধিবেশনে প্রদত্ত চপলার সেই তেজোপূর্ণ বক্তৃতা এখনও কাণে ধ্বনিত হইতেছে। এমন তেজোময়ী কথা প্রফুল্লমুখে, সুমিষ্ট ভাষে অথচ সুস্থির চিত্তে কেহ কখনও বলিতে পারিবে কিনা, জানি না—একাগ্রচিত্তে মহিলামণ্ডলি ঐ সুমধুর তেজোভরা বাণী শুনিতে শুনিতে আত্মহারা হ'ত। তখনকার তা'র সেই হাস্যপূরিত মুখ, সেই ভাব-কুঞ্চিত ললাট, সেই আনন্দে নৃত্যকারী চোখ এখনও মনশ্চক্ষে ভাসিতেছে। তা'র স্বদেশপ্রেম দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইতাম এবং তাহারই আদর্শ আঁকিয়া জীবন তৈরী করিতেছিলাম।

"চপলা বড়ই সঙ্গীতপ্রিয় ছিল—নিজের অতি স্নিগ্ধমধুর কণ্ঠ ছিল—গাহিবার একটা বিশেষ ক্ষমতা ও কায়দা ভগবান তা'কে দিয়াছিলেন। সে প্রতি অধিবেশনে—

"না জাগিলে সব ভারত-ললনা
এ ভারত আর জাগেনা জাগেনা"—

এই সঙ্গীতটী বেশীর ভাগ গান করিত। সর্ব্বদাই বলিত, আমরা না উঠিলে ভারতের কল্যাণ নাই। আমাদের ছাড়া পুরুষ সত্ত্বাহীন। আমরা পুরুষের ভিতর হ'তেই দেশের জন্য নিজকে নিয়োজিত রাখিব। চিমনীর ভিতর যেমন আলো—তেমনি পুরুষের ভিতর নারী—আলো ছাড়া যেমন চিম্‌নী নিরর্থক —তেমনি নারী ছাড়া পুরুষও শক্তিহীন! আমরা আলোর মত পুরুষের ভিতর থেকেই নিজের কর্ত্তব্য সাধন করিয়া ধন্য হইব। এইরূপ কত কথায় সে মহিলাদের উৎসাহিত করিত। এত অল্পবয়সে তার প্রতিভা দেখে বিস্মিত হ'তে হয়। .. শিল্পকার্য্যে সে খুব অনুরাগী ছিল। ললিত কলা তা'র বড়ই আগ্রহের জিনিষ ছিল—সে নিজহাতে নানা প্রকার সূক্ষ্ম-কারুকার্য্য প্রস্তুত করিত। তা'র গুণাবলী লিখিবার শক্তি আমার নাই—আমরা এমনই রত্ন হারাইয়া হাহাকার করিতেছি। যা'কেই সে নিজ গুণালোকে আকৃষ্ট করেছে, তারাই আজ গভীর শোকে ম্রিয়মাণ—হায়, আমাদের সান্ত্বনার কিছু

* সুদীর্ঘ পত্রের একতম অংশ উদ্ধৃত।

নাই। তবে শুধু ইহা বলেই যা' কিছু সান্ত্বনা :—

"এত নাহি কামনার দেশ,
রঙ্গভূমি শুধু কল্পনার।"

এই সম্মিলনীর মুখপত্ররূপে এবং তাহা সম্ভব না হইলে স্বয়ং একখানি মাসিক পত্র বাহির করিয়া মহিলাসমাজকে আহ্বান করিবার তাহার বিশেষ ইচ্ছা ছিল। ভগবান্ পতিগৃহেও তাহাকে ঐশ্বর্য্য দিয়াছিলেন—অর্থবান্, কবিহৃদয়, সাহিত্যপ্রেমিক জীবন-সঙ্গীও চপলাবালা লাভ করেছিল। শ্রীমান্ মোহিনীমোহনের উৎকৃষ্ট "নলিনী-লাইব্রেরী"র গোপন কক্ষে এই তরুণ হৃদয়-যুগলের কত নব আশা ও কল্পনা বিকশিত হইত, ইয়ত্তা নাই। শ্রীমান্ মোহিনীমোহন গুহ লিখেছে :—"আহা, জীবনের এই অঙ্কুর উভয়ে বোসে বোসে কত ছবিই আঁকিতাম। আজ আমার সব শেষ ....।"

এই আনন্দ মুহূর্ত্ত নানা আকাঙ্ক্ষায় তাহাদের ভবনে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত:—

"সে মুহূর্ত্তে কত সুখ সে মুহূর্ত্তে হাসি ফোটে;
শিরায় শিরায় যেন হর্ষের লহরী ছুটে।
সুখের শতেক উৎস অবিরল বহে তায়—
কত সুখ-পদ্ম ফুটে প্রতিবক্ত কণিকায়।"

ভাবের এই মঙ্গল মূর্ত্তিকে প্রকৃতি দেবীও উৎসাহিত করিয়াছেন:—

"দূর দূরান্তর পর্ব্বত বিদারি'
ঝরিবে নির্ঝর জল;
গাহিব আমরা পরাণ আবেগে
ফুটিবে মনের বল।......"

এই জন্য প্রেমনিক্ত এই জগতের আহ্বান উপেক্ষিত হয় নাই:—

"কিসের আহ্বানে আজ সুখনিদ্রা মোর
ভেঙ্গে গেল কিরূপে কি জানি,
চমকিয়া জেগে দেখি সংসারের বুকে
আপনার প্রতিবিম্ব খানি।
"কে যেন কোথায় থাকি গোপনে গোপনে
আপনারে দিল চিনাইয়া!
মানস মোহন কত সুচারু ভূষণে
হৃদিখানি দিল সাজাইয়া!"

মহিলাদের উন্নতির জন্য চপলাবালার আকুল প্রার্থনা কোন বিশেষ কার্য্যমাত্রে নিবদ্ধ ছিলনা—তাহা দশদিক্‌মুখী উৎসের ন্যায় প্রত্যেক বিষয়ে তাহার হৃদয় সহজভাবে আকর্ষণ করিত। তাহা জীবনমাত্রকেই আলোকিত করিত:—

"হেথায় আঁধার নাই
সদা আলো বিরাজিত।
হেথা অশ্রুজল নাই
বিশুষ্ক মকর মত!
স্মৃতির আলোতে ধ্যান!
ঝলকিত প্রাণ খানি
বসন্ত সমীর যেন
প্রেম সদা সমীরিত।" *

শ্রীমতী হেমন্তবালা দত্তের করকমলে প্রেরিত চপলাবালার একখানি চিঠির কতক অংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"হেম, আশীর্ব্বাদ কর এবং বিভুপদে প্রার্থনা কর যেন কখনও দেশের কাজে বিমুখ না হই। জন্মভূমির কাজ যেন আজীবন করিতে পারি। ভাই, আমার ন্যায় মাতার অক্ষম তনয়া কি কখনও মায়ের কাজ করিতে পারিবে? আমার অপরিসীম বাসনা পূর্ণ হইবে? জন্মভূমির কাজে কি দেহপাত করিতে পারিব?—অত সৌভাগ্য কি আমার ভাগ্যে ঘটিবে? আমাদের উৎসাহ এবং উন্নতির পথ যে কণ্টকাকীর্ণ—আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার উপর শত হস্ত উত্তোলিত—আমাদের নবজাত আশা ও আদর্শকে যে সমাজ কোরকেই নির্ম্মূল করিতে সচেষ্ট! বল দেখি, আমাদের সৌভাগ্য-সূর্য্য কি উদিত হইবে? হেম, আমার দৃঢ় বিশ্বাস তুমি কি বল জানিনা—যত দিন রমণীরা দেশের কাজে না মাতিবে, ততদিন উন্নতির কামনা আকাশ-কুসুমবৎ—কারণ সব বিষয়ে রমণীদের কর্ত্তব্য কাজ বেশী।

"হেম, পূজা আসছে—এই ত পরীক্ষার দিন—এই অগ্নি পরীক্ষায় সমস্ত দেশবাসীকে উত্তীর্ণ হওয়া চাই॥

"ভাই, তুমি সেখানে থেকেও প্রাণপণে দেশের কাজ করিত। আমার বিশ্বাস, সভা-সমিতি থেকেও পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের প্রাণে

* শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহনের অপ্রকাশিত কবিতা, "হাসি", "বসন্ত" ও "তারুণ্য" হইতে উদ্ধৃত হইল।

যদি স্বদেশ-প্রেমাগ্নি জ্বালাতে পার, তবেই দেশের প্রকৃত কাজ করা হয়। পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা সরল—তাদের প্রাণে যা' একবার লাগাতে পারা যায়, তা ও'রা কিছুতেই বিস্মৃত হবে না। আমরা পূর্ণ উৎসাহের সহিত সমিতির কাজ চালাচ্ছি। আমার বিশ্বাস, আজ না হয় দশ বৎসর পরেও আমার আশ সফল হবে। ভগবৎ চরণে একমাত্র প্রার্থনা তিনি যেন দয়া করে আমাদের আশা সফল করেন। বিধাতার যদি ইচ্ছা থাকে, তবে শত বাধা বিপত্তিতেও আমরা বিচলিত হইব না। মা জন্মভূমি যেন তাঁর অধম কন্যাদের তাঁরই সেবার উপযুক্ত করিয়া তোলেন।"

শ্রীমতী হেমন্তবালা চপলাবালার জ্যেষ্ঠ সহোদরাকে লিখিতেছেন :—

"আমার জীবন আজ যেন লক্ষ্যহারা হইয়া পড়িয়াছে—হায়, আমি যখন তার জন্য এতই আকুল হয়ে পড়েছি—তখন না জানি তোমাদের মনের অবস্থা কি ভয়ানক! আমি রচনা বা কবিতা কিছুই লিখিতে পারিতেছি না—সর্ব্বত্রই চপলাময় হইয়া পড়িতেছে। ·· দিদি, চপলার পত্র বন্ধ হওয়া অবধি আমি বাস্তবিকই শান্তিহারা হইয়াছি। দিদি! আজ আমার উৎসাহ, আশা, দিবার মত সাথীদের মধ্যে কেহই নাই।"

চপলাবালার অন্যান্য বহু চিঠি উদ্ধৃত করিবার স্থান এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে নাই। প্রত্যেক চিঠির মাঝেই তাহার একটা বিশেষ সত্তা উদ্ভাসিত হয়। দেশচর্চামূলক চিঠি ছাড়া তাহার পারিবারিক চিঠিগুলির মাঝে একটী অনির্ব্বচনীয় স্নিগ্ধ ভাব-প্রবাহ আছে যে, সহজেই তাহা হৃদয়কে আকর্ষণ করে।

ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা কখনও কোথায়ও চপলাবালার মোহ অতিক্রম করিতে পারে নাই। তাহাকে জড়াইয়া, তাহার হাস্যে পুলকিত হইয়া,তাহার ক্রোড়ে উঠিয়া শিশুরাজ্যে তৃপ্ত হইত। সে নিজ হাতে তাহাদের পরিচ্ছদ এবং অঙ্গভূষণ অর্পণ করিয়া তাহাদের আনন্দবর্দ্ধন করিত। পূর্ব্বে বলিয়াছি, দেবীর ন্যায় তাহার একটা অনির্ব্বচনীয় প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা ছিল।

তাহার নানা মাঙ্গলিক প্রশ্ন বিচারে এখন একটী সহজ দৃষ্টি ছিল যে, তাহার অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠগণ অনেক সময় তাহার মতামতকে বিশেষ মূল্যবান মনে করিত। রাশি রাশি গ্রন্থ অধ্যয়নও তাহার উজ্জ্বল প্রতিভার সম্মুখে যেন ম্লান হইয়া যাইত। কাব্য, ইতিহাস মাত্র নহে—ললিতকলা সম্বন্ধে তাহার যেন একটা অপূর্ব্ব তীক্ষ্ণ, মর্ম্মভেদী দৃষ্টি ছিল।

দেবী প্রতিম চপলাবালার কর্ম্মোজ্জ্বল জীবনের অপূর্ব্ব আলোকে পুলকিত, বেদনাপীড়িত পরমশ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী সরোজবালা গুহ, মহিলাসমাজের অন্যতম প্রতিভূরূপে যে কবিতা লিখিয়াছেন, তাহার সরল ভাবোচ্ছ্বাসের মাঝে চপলাবালার পার্থিব নিষ্ঠা ও দেবীমূর্ত্তি তুলিকাঘাতে বিকশিত হইয়াছেঃ—তাহার কিছু উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

" . .. .

ভগিনী সমাজ আজি
হারায়ে তোমারে!
চৌদিকে পুড়িছে ভাই
শোক-হাহাকারে!
বিমল যশোরাশিতে, শোভি' জন্মভূমি,
ক্ষণপ্রভা সম কোথা লুকাইলে তুমি!
মনে ছিল এই সাধ, পতিত মায়েরে,
সাজাবে অতুলনীয়, যশোরত্নহারে।
আমার আঁধাররাশি, সবারে গগনে—
উজলিবে দশদিক, মধুর কিরণে।
পতিত দেশের ভালে বালারুণ সম,
প্রকাশিবে নিজ তেজঃ অতি নিরুপম,
হায় রে! ফুটিয়া উঠিবে তব জীবনের কলি,
ছিঁড়ে নিল নিদারুণ ঝটিকায় দলি।
কুঁড়িতেই ছায়াময় নিঠুর সমন—
সোণার জীবন তব করিল হরণ।
তোমার জীবন কলি-মলয় অনিলে—
পারিজাত ফুল সম মৃদু মৃদু দুলে।
বিতরি সৌরভ রাশি মোহিবে ধরণী।
বড় সাধ ছিল মনে নারীরত্ন-মণি!
কে আর দূরিবে এই কুয়াসান্ধকার—
কে আর মুছা'বে মার নয়ন আসার!
স্বদেশের কণ্ঠে কণ্ঠে হাহাকার ধ্বনি।
তোমার গৌরব কীর্ত্তি দিবস রজনী।
ভারত-মাতার দুঃখ কে বুঝিবে আর,

কে লইবে পুণ্যব্রত দুঃখ-বেদনার।
হে রমণী-মণি, কর সমিতি গঠন,
দেখুক তোমারে দেশ, সাধনা-মগন।
হোম-অগ্নি জ্বাল, জ্বাল, রমণী-হৃদয়ে,
দাও তব পুণ্যমন্ত্র নির্ম্মল নিলয়ে।
আপনি হাসিয়া তুমি হাসাও সবায়।
নব প্রাণ দাও সবে, আছে মৃত প্রায়।
যাও ভাই পুণ্যধামে—পুণ্য সিংহাসন,
পাতিয়া রেখেছে যিনি নিখিল কারণ।
প্রেমময়ি। মনে রেখো জনমভূমিরে।
বিন্দুমাত্র দিও প্রেম পতিত দেশেরে।
সে অমিয় ধারা পিয়ে অযুত রমণী—
চলিবে সকলে মিলে সেই পথ চিনি।"

. . . .

অত্রত্য রমণীসমাজ দেবী-প্রতিম চপলা বালার স্বর্গমনে মুহূর্ত্তের মাঝে কিরূপ লুপ্ত-প্রায়, এবং শক্তিহীন হইয়াছে—এই কবিতায় তাহার সামান্য আভাস পাওয়া যায়। এই অভাবের ক্রন্দন-ছায়া আজ এই প্রদেশের কোন্ পল্লীর গৃহ কোণে পড়ে নাই? উচ্চ আদর্শ, উচ্চতর ধর্ম্ম-প্রাণতা, মহিলা-সমাজের মৌন গৌরব-গীতি যাহার হৃদয়ে প্রতি মুহূর্ত্তে দীপশিখার ন্যায় কম্পিত হইত, আজ তাহার অন্তরে হঠাৎ দেশে যে অন্ধকার—দুর্ভেদ্য, দুর্লক্ষ্য ঘন—উপস্থিত হইয়াছে, জানি না, কখন তাহা দূর হয়।

চট্টগ্রামে বিগত বৎসর যে বৃহৎ প্রদর্শনী হয়, মহিলারা এবং অন্যান্য শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সেখানে নানা কারু দ্রব্যাদি প্রেরণ করেন। এই প্রদর্শনী সম্বন্ধে তাহার মতামত জিজ্ঞাসা করিলে সে তৎক্ষণাৎ বলে—'মেয়েদের এই প্রদর্শনী দেখিবার সুবিধা-জনক বন্দোবস্ত আছে ত? নচেৎ মেয়েদের শিল্প দ্রব্য পাঠিয়ে কি লাভ? তারা না দেখ্‌লে, না শিখ্‌লে, দেশের কিছু হবে না।"

চট্টগ্রাম জেলা সমিতিতে মেয়েদের দেখিবার এবং শুনিবার সুবন্দোবস্ত তাহার অক্লেশ উৎসাহেই হইয়াছিল। শিশুবৎ ব্যবহারে সে সকলের হৃদয়ের আনন্দবর্দ্ধন করিত।

বাল্যকাল হইতেই তাহার একাগ্রতা সকলকে বিস্মিত করিত। সে একবার না খেয়েই স্কুলে যায়—খাবার কথা মনেও ছিল না। স্কুলে কোন মাষ্টার তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, আজ কি খেয়েছ? কি উত্তর দিবে, কিছু ঠিক করিতে পারিল না—তখন ও'র মনে হয় যে আজ বাড়ী থেকে খেয়ে আসে নাই—এদিকে মাতৃদেবী লোক পাঠিয়েছিলেন—তা'র সঙ্গে বাড়ী এসে আহার করে' আবার স্কুলে যায়।

শ্রীমান্ মোহিনীমোহন গুহ লিখেছেঃ—"সে প্রতিদিন ঘুমাবার পূর্ব্বে প্রাতে এবং স্নানের পর গলবস্ত্র হ'য়ে প্রণাম কোর্‌ত; আমি একদিন অনেক করে' জিজ্ঞেস করার পর বোলেছিল—"মা বাবাকে নমস্কার করি।" পিতামাতার প্রতি তা'র ভক্তি অসীম—সে কত আক্ষেপ করিত—বলিত যে পিতামাতা মেয়ের জন্য ছোটকাল হ'তে এত করেন—তাঁদের সুখশান্তির জন্য মেয়েরা কিছুই করিতে পারে না। আরো কত কথা বলিত, তা'র ঠিক নাই।" শ্রীমান্ মোহিনীমোহন আবার লিখেছেঃ—"চট্টলের মহিলা-সভা, তার অতি আদরের ছিল—একথা বলাই বাহুল্য। ভবিষ্যতে সে সভার কিরূপভাবে উন্নতি করিবে—কিরূপে সকল মহিলা একত্রিত হ'য়ে স্বদেশের কার্য্যে লিপ্ত থাক্‌বে, স্বদেশের উন্নতির জন্য কাজ করিতে শিখিবে—ইত্যাদি কত কথাই বলিত, ইয়ত্তা নাই। আমি ঠাট্টা করিয়া যদি বলিতাম—"তোমরা দেখ্‌ছি আমাদের অন্তঃপুর শূন্য কোর্‌বে।"—তাহাতে সে বলিত—"আমরা নিজে লেগে পড়ে' কাজ কোর্‌বার জন্য বল্‌ছি? —আমরা শিখ্‌বো—আমাদের জ্ঞান হবে—তা'তে তোমাদের কতদূর লাভ, দেখত—তোমাদের রাজনৈতিক ইত্যাদি জটিল চিন্তার সহায় হ'তে পার্‌ব।"

রমণী-মণি চপলাবালার কত কল্পনা ছিল, ইয়ত্তা নাই। কতদিন অবিরত তিন চার ঘণ্টা এসব বিষয় আলোচনা করিয়া ক্লান্ত হইত না। অমন মিষ্ট মধুর ভাষা, উচ্ছ্বসিত আবেগ-প্রবাহের স্বচ্ছ সারল্য, শিশুর ন্যায় স্মিত হাসা, আনন্দে হিল্লোলিত জীবনধারা, জ্যোৎস্নার ন্যায় চারিদিকের ম্লান প্রাণীরাজ্য যেন বিকশিত করিয়া তুলিত।

একবার চপলাবালার কোন জ্যেষ্ঠ সহোদর প্রস্তাব করিয়াছিল—মেয়েরা সহজে বেড়াইতে পারে—আলোচনা করিতে পারে, পরস্পরের সহিত ভাব বিনিময় করিতে পারে, *এমন একটা অন্তর অপ্রবেশ্য উদ্যান রচনা* করিলে কেমন হয়? যেখানে একটা স্বচ্ছ দীর্ঘিকা থাকিবে—চারিদিকে নানা বিচিত্র লতাবিতান, পাদপশ্রেণী প্রভৃতি প্রকৃতির বিচিত্র সম্ভার উন্মুক্ত করিবে।

শুধু নারী রাজ্যের প্রবেশাধিকার থাকিবে! এই প্রস্তাব শুনিয়া সে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়—এবং কতবার তাহার অগ্রজকে ইহার অনুষ্ঠান করিতে প্রতিশ্রুত করাইয়াছে, ঠিক নাই।

বাঙ্গালাভাষার উপর তাহার বড় বিচিত্র অধিকার ছিল। যে কোন সঙ্গীত যেমন তাহার কণ্ঠে একটা অনির্ব্বচনীয় নবরস লাভ করিয়া, নিজদেহে বিদ্যুৎসঞ্চার অনুভব করিত, তেমনি, তাহার হাতে ভাষাটীও যেন অভিমানিনী, শিশুহৃদয়ের অকৃত্রিম কল্পগীতির ন্যায় সহজ উৎসাহ অনুভব করিত।

তাহার লেখনীর মুখে যেন আপনা আপনি সাহিত্যসুন্দরী, যূঁই-বেল, অশোক-বকুল বিকীর্ণ করিতেন। ভগবান তাহার জীবনমুকুল বিকশিত হইবার পূর্ব্বেই নিজের ক্রোড়ে লইয়া গেলেন। তাহার লিখিত চিঠিগুলি তাহার প্রতিভার প্রমাণ, তাহার তরুণ হৃদয়ের প্রতিবিম্বরূপে রহিয়াছে মাত্র।

এই সমস্ত উদ্ধৃত করার স্থান এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে নাই। যদি তাহার জীবনী লিখিত হয়—তবে বোধ হয় তাহা দেখিবার সুযোগ ঘটিবে।

তাহার জীবনসখার প্রতি বিস্ময়জনক প্রেম-ভক্তি, এবং এই হৃদয়যুগলের মাঝে প্রস্ফুটিত অশ্রান্ত বিগলিত ভাব রসে কি কখনও এই রূপরসগন্ধময় পৃথিবীর শ্যামল অঞ্চলে কোন সার্থকতা লাভ করিবে না? শ্রীমান্ মোহিনীমোহন গুহ লিখেছেন:—"আমি ছল করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে চপলা বলিত:—স্মৃতি যদি আত্মার মত অবিনশ্বর হয়, যদি আত্মার অনুসরণ করে, তবে তোমাকে অনন্ত অনন্ত কালও ভুলিতে পারিব না।'

এই অবিচ্ছেদ্য অনন্তকালের মাঝে ঐই বহুসাময় জগজ্জালের সূক্ষ্ম-পেলবনীল হরিৎ তন্তুরাজ্যে কি কোথাও ধীরে ধীরে এই হৃদয়-যুগলের বেদনা ও কল্পনা গ্রথিত হইয়া সফলতা লাভ করিবে না?

বিধাতা রমণী-মণি চপলাবালাকে হৃদয়ের যেরূপ শ্রী দিয়াছিলেন—তেমনি দুর্লভ সৌন্দর্য্যও দান করিয়াছিলেন। তাহার হৃদয়ের কান্তিই অমর হইয়া গেল—তাহার তরুণ দেহ-শ্রী কোন স্বপ্নের মত কোন্ অজ্ঞাত রাজ্যে চলিয়া গেল। তাহার উদ্দেশে পূর্ব্ব-রচিত শ্রীমান্ মোহিনীমোহনের নিম্নলিখিত কবিতাটী চপলাবালার স্বর্লোকগমনের পর যেন চপলাবালার অমূর্ত্ত হৃদয়লক্ষ্মীকে, তাহার দেবপুরী সঞ্চারী মর্ত্ত্যদেহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে নূতন ভাবে ও ছন্দে শূন্য-ভবনে আহ্বান করিতেছে। ঐ মায়ামূর্ত্তি যেন দিব্য সৌন্দর্য্যে ভাসিতেছে—

"মানস মন্দির মাঝে রূপসী রমণী এক
স্মিতময়ী চঞ্চলা চপলা।
কনক চম্পক গৌরী, সুবর্ণ প্রতিমা যেন
উরমিত কুঞ্চিত কুন্তলা।
চপল সরল শিশু ও বিধুবদন মাঝে,
কি মোহিনী আছে যেন মাখা;
সৌন্দর্য্য-সিকতা ওই স্ফুটিত তরুণ বক্ষে
মোহমন্ত্র আছে যেন আঁকা।"

ইহলোক ত্যাগের তৃতীয় দিবস নিঃশব্দ পল্লীর বাপীরতটে শান্তহৃদয়ে উপস্থিত হইয়া যখন জ্যোৎস্নালোকে তাহার শ্মশান-শয্যা দেখিতেছিলাম, তখন সারিসারি আম্রবৃক্ষের বোমাঞ্চিত বীথিকা, কদম্বতরুর নতশীর্ষ পুষ্প-কোরক, ব্যাকুল বাপীর হৃদয়বক্ষে অঙ্কিত বিষন্ন মহীরুহ-ছায়া, ঝিল্লির রুদ্ধবক্ষ মর্ম্ম-গুঞ্জনের মাঝে তাহার পবিত্র মুক্ত আত্মাকে স্মরণ করিলাম—ভাবিলাম—

"স মৃত্যুপাশান্ পুরতঃ প্রণোদ্য
শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে।"

শ্রীযামিনীকান্ত সেন।

বাঙ্গালায় জাতীয় শিক্ষা।

বাঙ্গালার একজন চিন্তাশীল রসিক-পুরুষ কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়-মন্দিরকে "গোল দিঘীর গোলামখানা" নাম দিয়াছিলেন। ঠিক গোলামখানা না হইলেও, বিদেশীয় রাজপুরুষগণের কার্য্যের সাহায্যের জন্য, রাজজাতীয় লোক অপেক্ষা বহু অল্প বেতনে সন্তুষ্ট অথচ সম্যক্ কার্য্যপটু কতকগুলি কর্ম্মচারী, এবং নিত্য নূতন মামলা মোকদ্দমার সৃষ্টি করিয়া রাজকোষ পুষ্ট করিবার জন্য এবং ঐ সকল মোকর্দ্দমায় দোভাষীর কাজ করিবার জন্য কতকগুলি উকীল মোক্তার তৈয়ার করিবার উদ্দেশ্যেই যে কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের বিশ্ববিদ্যালয় গুলির সৃষ্টি হইয়াছিল,—এ দেশের এবং বিলাতের অনেক সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতের ইহাই সিদ্ধান্ত। সুবিখ্যাত অধ্যাপক বেভাঃ ফাদার লাফোঁ এদেশে অধ্যাপনা কার্য্যেই জীবন পাত করিয়া গিয়াছেন। এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান প্রণালীতে একটা অতি বড় বঞ্চনামূলক ব্যাপার বলিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। (The system of University education in this country is a huge sham) স্থিরবুদ্ধি, সুপণ্ডিত, সর্ব্বজনমান্য শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, ইংরাজী শিক্ষার বর্ত্তমান অবলম্বিত প্রণালী এ দেশে সন্তোষজনক সুফল প্রসব করিতে পারে নাই। (The existing system of English education has failed to produce satisfactory results) [illegible]

সদ্বংশে জন্মলাভ পরম সৌভাগ্যের কথা, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভগবৎ-কৃপা সাপেক্ষ। জন্মের পরেই, মানব চরিত্রে শিক্ষা এবং সংসর্গের প্রভাব প্রধানতঃ ক্রিয়া করে। শিক্ষা এবং সংসর্গ গুণে মনুষ্য দেবতা হয়, আবার শিক্ষা ও সংসর্গের দোষেই মানুষ দানবে পরিণত হয়। ইতিহাস-কীর্ত্তিত বহু ব্যক্তির জীবনেই শিক্ষা এবং সংসর্গের প্রভাবের বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। জগদ্বিখ্যাত ইংরাজবীর ডিউক অব্ ওয়েলিংটন যথার্থই বলিয়াছিলেন যে, ওয়াটার্লু বিজয়ের আদি কারণ সুপ্রসিদ্ধ ইটন বিদ্যালয় প্রাঙ্গণেই প্রথম উপ্ত হইয়াছিল। (The battle of Waterloo was won on the field of Eton) পূর্ব্বতন শিক্ষা দান-পদ্ধতি এবং ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পুণ্যফলে এদেশে পুরাকালে কত দেবচরিত্র মহাপুরুষের দর্শন লাভ ঘটিত। হায়! ভারতবাসী আজ আশ্রম-ভ্রষ্ট, বিপন্ন, তাই ভারতের আজ এত দুর্দ্দশা॥

বৈচিত্র্যময় ভগবানের রাজ্যে মনুষ্যের প্রত্যেক জাতিরই কতক গুলি বিশিষ্টতা আছে। একজন ইংরাজের সহিত একজন নিগ্রো কিম্বা আফ্রিদির কত বৈষম্য, তাহা আমরা অনেকেই অবগত আছি। একজন চিন দেশীয় লোকের সহিত একজন ফরাসির রুচি, প্রকৃতি এবং শক্তির বহু পার্থক্য। এক দেশীয় লোকের সহিত অপর এক ভিন্ন দেশীয় কিম্বা ভিন্ন জাতীয় লোকের শক্তি ও প্রবৃত্তির বহুলাংশে সৌসাদৃশ্য হইতে পারে

না। ভারতীয় আর্য্য সন্তানগণের স্বাভাবিক মস্তিষ্ক শক্তি এবং বংশানুগত রীতি প্রকৃতির সহিত ইউরোপ-দেশজাত বালকগণের বহু পার্থক্য আছে। বহু শত সহস্র বৎসরের ভারতীয় সভ্যতাসিক্ত আর্য্য ঋষিগণের আধ্যাত্মিক জ্ঞানপুষ্ট, একটী বিশিষ্ট স্বভাবাপন্ন আর্য্য বালকগণের শিক্ষাদান পদ্ধতি,—পঠন পাঠন বিধি এবং পাঠ্যাদিও সুতরাং স্বতন্ত্র রূপ প্রয়োজন।

বিজ্ঞান শাস্ত্রানভিজ্ঞ, উদ্ভিদ তত্ত্বে অধিকার শূন্য কোন শিশু, শুধু নামের কিম্বা বর্ণের সৌসাদৃশ্যে ভ্রান্ত হইয়া যদি সতেজ, সপত্র, সমূল একটী স্ফুটনোন্মুখ পদ্মকোরক জন্মভূমি-জলাশয় হইতে উত্তোলিত করিয়া তাহার আপন উদ্যানস্থ স্থলপদ্ম বৃক্ষের পার্শ্বদেশে রোপণ করে, তবে অল্প কয়েক দিন মধ্যেই যে নয়নমনোরম সুকোমল পদ্মকোরকটী শুষ্ক হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, তাহার আর সন্দেহ কি? আমাদের দেশের অনেক বালকের দশাও ঐ পদ্মকোরকের ন্যায় শোচনীয় হইয়াছে। বিকৃত শিক্ষার ফলে সুকোমল নন্দন-পারিজাত, আজ বজ্রাপেক্ষাও ভীষণ কঠোর হইয়াছে, শুনিলে বিস্মিত হইব না।

আত্মহত্যা এদেশে চিরদিন মহাপাপ, ধর্ম্ম-বিগর্হিত কার্য্য বলিয়া পরিগণিত। দুঃখের বিষয়, ইংরাজী শিক্ষায় বিকৃতবুদ্ধি বঙ্গীয় যুবকগণের মধ্যে আজকাল অতি সামান্য কারণে আত্মহত্যার কথাও শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ "প্রত্যক্ষ দেবতা" পিতার তিরস্কার-ভয়ে কিম্বা অভিমানে, কেহবা কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া, লজ্জায় অপমান ভয়ে আপনার প্রাণ আপনি বিনষ্ট করিতেছে, এরূপ প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। দেশে এ মহাপাপ কেন ও কিরূপে সঞ্চারিত হইল, অনেকে ভাবিয়া আকুল। জড় বিজ্ঞানের প্রাথমিক অল্পশিক্ষা বা অপশিক্ষার দ্বারা বিকৃতবুদ্ধি আর্য্যসন্তান, পূর্ব্বপুরুষগণের সেই অধ্যাত্ম তত্ত্বানুরাগ আজ বিস্মৃত হইয়াছে। খ্রীষ্টান পাদ্রী প্রভৃতির মুখে প্রাচীন আর্য্যগণের অহর্নিশি অযথা নিন্দাবাদ শুনিতে শুনিতে, হিন্দুর অধ্যাত্মতত্ত্বানুরাগ—অপদার্থতা কিম্বা বিকৃতবুদ্ধির পরিচায়ক বলিয়া, উপহাস করিতে শিখিয়াছে। আত্মার অবিনশ্বরত্বে বিশ্বাস, পরকালে বিশ্বাস, কর্ম্মফলে বিশ্বাস,—এ গুলি কুসংস্কারের অশুভফল বলিয়া সর্ব্বত্র শুনিতে শুনিতে, কিছুমাত্র বিচার আলোচনা না করিয়া, না জানিয়া, না বুঝিয়া, প্রাচীন আর্য্যগণকে 'মূর্খ' সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছে। আর্য্যগণের বিজ্ঞানে কিছুমাত্র বোধ ছিল না, বেদ কৃষকের গান, ইত্যাদি শুনিতে শুনিতে, আর্য্যসন্তান, আজ পরকালে, কর্ম্মফলে অবিশ্বাসী, পাপপুণ্য বিচারের অনিচ্ছুক এবং অনধিকারী। তাহার ফলে আজ এদেশে ভদ্রসন্তানের মধ্যে আত্মহত্যার এত আধিক্য। পাশ্চাত্য প্রেত-পিশাচ এনার্কিষ্ট, নাইহিলিষ্ট, সোসিয়েলিষ্ট, ইত্যাদির অনুকরণে এদেশে একদল বিপ্লববাদীর সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া কিছুদিন যাবৎ শুনা যাইতেছে। আর্য্য-সন্তানের শিক্ষা দীক্ষা এভাবে ঘটিলে—মতি গতি এরূপে পরিচালিত হইতে থাকিলে, কালে আরও কি দেখা যাইবে, কে বলিতে পারে?

কারণ ব্যতীত জগতে কোন কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। বর্ত্তমান যুগের বিকৃতবুদ্ধি উন্মার্গগামী বাঙ্গালী বালকগণকে আজ অনেকেই অজস্র তিরস্কার করিতেছেন। "যাহারা বিপ্লববাদী এনার্কিষ্ট, যাহারা স্বদ-

জের ধন মান সুখ শান্তির ব্যাঘাতক, যাহারা পরস্বাপহারী দস্যু, তস্কর কিম্বা নৃশংস নরঘাতক, তাহারা ভগবানের চক্ষে যেমন অপরাধী, প্রকৃতিস্থ মনুষ্যমাত্রের নিকটও তাহারা সেইরূপ দণ্ডার্হ, ঘৃণার্হ। তাহাদের সহবাস এবং সহকারিতা সর্ব্বাংশে পাপ বলিয়া পরিত্যজ্য। কিন্তু ইহাদের এই দুষ্ট-বুদ্ধি কি কারণে প্রণোদিত হইল, নিরীহ শান্ত শিষ্ট ভদ্রলোকের ছেলেরা কেন এরূপ নরশোণিত-লোলুপ নরশার্দ্দূলে পরিণত হইল, তাহা নির্দ্ধারিত করিবার জন্য এ পর্য্যন্ত কয় জন চেষ্টা করিতেছেন, জানি না।

ভারতীয় আর্য্য-সন্তানগণের ধাতু প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, জড়-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ উপাসক ইংরাজ, তাঁহাদের নিজসন্তানদের উপযোগী, অবিমিশ্র পাশ্চাত্য পন্থার অনুসরণে এদেশের বিদ্যালয় সমূহে আর্য্য-বালকগণের শিক্ষা দান বিধান প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। ইংরাজ কি উপায়ে সুলভে কেরাণী এবং দোভাষী উকীল মোক্তার পাইবেন, এই চিন্তায় যতটা ব্যাকুল ছিলেন, ভারতীয় আর্য্যজাতির পূর্ব্বতন আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ততটা চিন্তিত হন নাই—এত প্রয়োজনও বোধ করেন নাই। হিন্দুর আদর্শ অব্যাহত রাখিতে পারিলে আজ ভারতের এমন দুর্দ্দশা হইত না।

হিন্দুর ন্যায় প্রাচীন এবং ধর্ম্মপ্রাণ জাতি জগতে আর দ্বিতীয় নাই। এই হিন্দুজাতির জীবন চারিটী ক্রমোন্নতিশীল আশ্রমধর্ম্মে বিভক্ত। চতুরাশ্রমময় হিন্দুজীবনের প্রত্যেকটী আশ্রমই সত্ত্বগুণের প্রবর্দ্ধক। সত্ত্বগুণের চরমস্ফূর্ত্তির অপর নাম ব্রহ্মপ্রাপ্তি, হিন্দুর সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনার প্রধানতম লক্ষ্য ছিল ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা ব্রহ্মসম্ভোগ। তপোবদ্ধ জ্ঞানবলে আর্য্যঋষিগণ নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, একমাত্র ব্রহ্মসম্ভোগেই মানবজীবনের পরম পরিতৃপ্তি। সত্ত্বগুণের সাধনাদ্বারাই ব্রহ্মপ্রাপ্তির—ব্রহ্মসম্ভোগের সম্ভাবনা। এই সত্ত্বগুণের সাধনাও সময়সাপেক্ষ,—একদিনে বা অল্প সাধনায় কেহ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। সূক্ষ্মদর্শী ক্রমবাদী হিন্দু জানিতেন যে, মাতৃগর্ভে জন্মলাভের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে পিতামাতার দেহ ও মনের অবস্থাভেদে, মানবশিশুর ভাবীজীবনের স্বাস্থ্য ও প্রকৃতির তারতম্য ঘটে। এজন্য বিবাহ এবং গর্ভাধান সংস্কারের সময় হইতেই ভাবী সন্তানের সতত শুভকামনায়, শাস্ত্রাদেশ-পরিচালিত পূর্ব্বতন হিন্দুগণ এতটা সাবধান ছিলেন।

নিবিষ্টচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে হিন্দুর আশ্রম চতুষ্টয় এবং সংস্কার বিধি গুলি ব্যক্তিগত চরিত্রের এবং জাতিগত প্রকৃতির উন্নয়নেরই পরিপোষক এবং সে গুলির প্রতি অবহেলা করিলে ব্যক্তিগত ও সমগ্র জাতিগত প্রকৃতির অবনয়ন ঘটিবারই আশঙ্কা। হায়! কি গভীর পরিতাপের বিষয়! কালধর্ম্ম প্রভাবে, অবস্থাবশে ও ব্যবস্থাদোষে, আর্য্য সন্তান আজ পথভ্রান্ত, আশ্রমভ্রষ্ট। ব্রহ্মচর্য্য-বিচ্যুত, বিলাসিতা-ব্যাধিদুষ্ট, আর্য্যকুমারগণের এই শোচনীয় অধঃপতিতাবস্থার কথা মনে ভাবিয়া, হৃদয়বান সমাজহিতৈষী আর্য্য-সন্তান, আপনি অজস্র অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে পারেন, কিন্তু তাহাদিগকে অভিসম্পাৎ করিবার পূর্ব্বে আপনার কর্ত্তব্যাবহেলার কথা এবং দেশের শিক্ষাযন্ত্র পরিচালকগণের ত্রুটি ও বিচারবিভ্রমের কথা কি একবারও ভাবিয়া দেখিবেন না? জাতীয় প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া বিজাতীয়—বিরুদ্ধ প্রকৃতির সম্যক্

উপযোগী, স্ত্রীশিক্ষা দান করিয়া আমরা,—অভিভাবকগণ কতটুকু অপরাধী, তাহা গণনা না করিলে আমরা কি প্রত্যবায়ভাগী হইব না? হায়! কি আশ্চর্য্যের বিষয়! যে কুশিক্ষার ফলে অপেক্ষাকৃত অধিকতর বুদ্ধিজীবী বালকগণেরই আজ এমন দুর্দ্দশা,—সেই শিক্ষায় আর্য্য বালিকাগণকে শিক্ষিতা দীক্ষিতা করিবার জন্য আমাদের দেশেরই কতক গুলি লোক আজও পাগল। কলিকাতার বেথুন কলেজেও ইহাদের চিত্তের সম্যক্ পরিতৃপ্তি হইল না। মফঃস্বলের নানা ক্ষুদ্র নগরে—এমন কি, ময়মনসিংহের মত ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র নগরেও একটা গেবলস্ হাই ইংলিশ স্কুল বিদ্যমান। শ্রীমন্মনু বলিয়াছেন—"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ"—বালিকাগণকেও যত্ন পূর্ব্বক সুশিক্ষা দান আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। কিন্তু তা বলিয়া এরূপে আমা কুমারীগণের মস্তক চর্ব্বণ। করা কি সঙ্গত না শুভকর? তবে সাহেব সুবার নিকট বাহবা পাওয়া যাঁহাদের উদ্দেশ্য, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র।

আর্য্য হিন্দুর সমগ্র জীবন এক ধর্ম্ম সূত্রে গ্রথিত। ধর্ম্মের সুকোমল স্নিগ্ধোজ্জ্বল আবরণে আর্য্য জীবন সদাই সুরক্ষিত, অথচ সরস, মধুর, মনোহর। যিনি দুর্ভাগ্য বশে এই ধর্ম্ম-ধনে বঞ্চিত, তিনি বস্তুতই কৃপাপাত্র এবং আর্য্য নামের অযোগ্য। "ধর্ম্ম" এই কথার প্রতিশব্দ অন্য কোন বিজাতীয় লোকের অভিধানে আছে বলিয়া মনে করি না—অন্ততঃ আমি জানি না। পাশ্চাত্য জগতের 'রিলিজিয়ন, (Religion) বলিতে আমাদের ধর্ম্মকে বুঝায়, বোধ করি না। ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ—মানব জীবনে এই দশটী মহদ্‌গুণের সমন্বিত সাধনাই আর্য্যেরা 'ধর্ম্ম শব্দে বুঝেন। বাল্য কাল হইতে প্রধানতঃ সংযম সাধনা দ্বারা এই 'ধর্ম্ম ধন' উপার্জ্জন করিতে হয়। সংযম সাধনার দ্বারাই ইহার প্রথম ভিত্তি স্থাপিত করিতে হয়। হায়! সর্ব্ববিধ সাধনার শ্রেষ্ঠ সিদ্ধপীঠ পুণ্যভূমি ভারত আজ আচার-ভ্রষ্ট, আশ্রম-জ্ঞানবর্জ্জিত, উৎমার্গ গামী ইহসর্ব্বস্ব অসুরের কবলে পতিত হইয়াছে। তাই নানা বিপর্য্যস্ত বীভৎস দৃশ্যে দেশ আজ পরিপূর্ণ।

কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায় ভারতে অমানিশার ঘনান্ধকারের পর আজ আবার নব অরুণ রেখা—অবশ্য এখনও দূরে—নয়নগোচর হইতেছে। পথভ্রান্ত, দুঃস্থ, বিকৃত, অধঃপতিত, আত্মানাত্মবিবেক-বিহীন ভারতসন্তান আবার এখন এত দিন পরে বিশ্বরাজের কৃপা কটাক্ষ লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইবে বলিয়া যেন মনে হইতেছে। প্রকৃত সুপথ এখনও অবলম্বন করিতে না পারিলেও, অন্ততঃ এটুকু যেমন জ্ঞান হইতেছে যে, যে পথে এত দিন আমরা চলিতেছিলাম, তাহা প্রকৃত সুপথ নহে। গন্তব্য সুখরম্য সুপথ কোথায় হারাইয়া ফেলিয়া আজ আমরা দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া মরণের পথে—ধ্রুব বিনাশের পথে চলিতেছিলাম।' এইটীই সময়ের শুভ চিহ্ন—ভগবানের প্রসন্নভাব প্রথম প্রস্ফুট আলোক রেখা। তাই আজ জাতীয় শিক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে ভারতের প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষী অনেক বুদ্ধিমান এবং ধনবান পদস্থ ব্যক্তি মনোযোগী হইয়াছেন। কলিকাতায় জাতীয়-শিক্ষা পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসবিহারী ঘোষ প্রকৃতি সরস্বতীর

সুপুত্রগণ এক দিকে, এবং ব্রজেন্দ্র কিশোর, সূর্য্যকান্ত প্রভৃতির ন্যায় লক্ষ্মীর কৃপা পাত্রগণ অপর দিকে, মায়ের মঙ্গল শঙ্খের মধুর নিনাদে আকৃষ্ট হইয়া জাতীয়-শিক্ষার সুব্যবস্থা বিধানের জন্য যত্নবান হইয়াছেন।

হিন্দুকে প্রকৃত হিন্দু রাখিতে হইলে, আর্য্য ভাব, আর্য্য প্রকৃতি অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত রাখিতে হইলে, হিন্দুর পূর্ব্ব গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, জাতীয় ভাবে, জাতীয় ভাষার সাহায্যে, উজ্জ্বল জাতীয় আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া, জাতীয় শিক্ষা দান জন্য জাতীয় বিদ্যালয়েরই প্রয়োজন বটে। কিন্তু নবপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যালয়গুলির আদর্শ, পাঠ্য, এবং পঠন-পাঠনরীতি আজও আমাদের সম্যক্ উপযোগী হইয়াছে বলিয়া মনে করি না। কলিকাতায় ও মফঃস্বলের জাতীয় বিদ্যালয় গুলি ঠিক যেন "কলিকাতা ইউনিভার্সিটীর" অধীনস্থ স্কুল কালেজেরই 'ছাঁচে' ঢালা বোধ হয়।

পূর্ব্বে আমাদের দেশের গ্রাম্য পাঠশালা গুলিতে "গুরু মহাশয়েরা' আজ কালের 'তথা-কথিত' উচ্চশিক্ষা দিতে না পারিলেও, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরামের মহাভারত, চাণক্য শ্লোক পড়াইয়া পাঠশালার 'পড়োদিগকে 'মানুষ' করিয়া দিতেন,—বাস্তবিক ইংরাজের তিন আর্ (three Rs.) অপেক্ষা আমাদের পাঠশালার ছাত্রগণ অনেক বেশী শিখিতে পারিতেন এবং প্রকৃত 'মনুষ্যত্ব' লাভ করিতে পারিতেন। আঁক, আখর এবং ধর্ম্ম নীতির প্রবচন গুলি অতি অল্প দিনে অল্প ব্যয়ে শিখিতে পারিতেন। জাতীয় বিদ্যালয় গুলির নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের জন্য কৃত্তিবাস, কাশীরাম পাঠ্য করা আবশ্যক নহে কি? চাণক্য নীতি, বিষ্ণু শর্ম্মার হিতোপদেশ আজও কি জন্মস্থান ভারতভূমিতে উপেক্ষিত হইবে? মনে রাখা উচিত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহণ করিলেও এবং যৌবনে পাশ্চাত্য সাহিত্য এবং সভ্যতার তীব্র সুরা আকণ্ঠ পান করিলেও, বাল্য কালে তদীয় হৃদয়-রাজ্যে কৃত্তিবাস যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহার প্রভাব কোন মতে পারবর্ত্তী কালে অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

আমরা এমন কথা বলিতেছি না যে, জাতীয় বিদ্যালয় গুলিতে ইংরাজী সাহিত্য, ইতিহাস এবং বিজ্ঞান—রসায়ণ পদার্থ বিদ্যাকে বাদ দিতে হইবে। তাহা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই বলিতে পারেন না। তবে রসায়ন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান আপনার পারিভাষিক শব্দের সাহায্যে, সহজ, সরল, সুবোধ্য করিয়া আমাদের বালকগণকে শিক্ষা দিতে হইবে। 'সংস্কৃত' গোত্র-সম্ভূতা ভারতীয় সমস্ত ভাষার বর্ণমালা এক দেবনাগর অক্ষরে লিখিত বা মুদ্রিত হইবার প্রশংসনীয় প্রস্তাব যেরূপ আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি, বিজ্ঞান বিষয়ক সমস্ত পারিভাষিক শব্দও, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের নানা ভাষান্তর ভেদ সত্ত্বেও, সর্ব্বত্র এক এবং অভিন্ন বলিয়া নির্ব্বাচিত, প্রণীত কিম্বা নির্দ্দিষ্ট হওয়া সঙ্গত মনে করি। ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতিও আমাদের আপন মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা প্রদত্ত হউক, এই আমাদের ইচ্ছা। ইংরাজী ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এই মাত্র বলিতে চাই যে, ইংরাজী না শিখিলে কৃষি, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। কিন্তু আমাদের মূল কথা এই যে, জড়বিজ্ঞান দেহের হস্ত পদা-

দির কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারে। সর্ব্বোপরি আর্য্যের ধর্ম্মাদর্শ দেহ যন্ত্রের মস্তিষ্ক শক্তির,—বুদ্ধির কার্য্য পরিচালিত করুক। আর্য্য সাহিত্যের ধর্ম্মভাব, দেবচরিত্র, পুণ্যপ্রভাব যেন সর্ব্বদা আমাদের বিদ্যার্থিগণের চক্ষের উপরে প্রতিভাত হয়।

তীক্ষ্মদর্শী সমাজহিতৈষী পরলোকগত সৈয়দ আহম্মদ সাহেব মোসলমান বালকগণের জাতীয় শিক্ষার সৌকর্য্যার্থে, অতীব প্রয়োজন বোধ করিয়া, বহুদিন পূর্ব্বে, আলিগড়ে একটী আদর্শ ইসলামী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। পঞ্চনদ প্রদেশের আর্য্য সমাজের ভ্রাতৃগণ লাহোরে 'এংলো বেদিক কলেজ' এবং উক্ত আর্য্য সমাজেরই অপর এক সম্প্রদায়ের কতিপয় দেশহিতব্রতধারী পণ্ডিত ব্যক্তি, পুণ্যক্ষেত্র হরিদ্বারে, পবিত্র জাহ্নবী তীরে 'গুরুকুল' বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়টী অতি অল্প দিন যাবৎ ইংরাজী ১৯০১ অব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার কার্য্য-পদ্ধতি ও পাঠ্যাদি অতি সুন্দর বলিয়া বোধ হয়। এই অল্প কয়েক বৎসর মধ্যে উক্ত গুরুকুল বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণ অষ্টাধ্যায়ী এবং মহাভাষ্য পড়িয়া পূর্ণ বৈয়াকরণ হইয়া, বৈদিক ও লৌকিক শব্দ সমূহের অর্থবোধ ও প্রয়োগ বিষয়ে সক্ষম হইয়াছেন। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বলিতেন যে, তিন বৎসর মাত্র পাণিনীয় ব্যাকরণ পাঠ করিলে যত দূর জ্ঞান জন্মে, "কুগ্রন্থ" অর্থাৎ সারস্বত, চন্দ্রিকা, কৌমুদী, মনোরমাদি পড়িয়া পঞ্চাশ বৎসরেও তাদৃশ জ্ঞান জন্মিতে পারে না। স্বামী দয়ানন্দের উপদেশানুযায়ী হরিদ্বার গুরুকুলের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রগণ ইতিমধ্যেই যাস্কমুনিকৃত নিঘণ্টু এবং নিরুক্ত অর্থবোধ সহকারে পাঠ করিতেছেন। অনেকে পাঁচ খানি দর্শন এবং ছয় খানি উপনিষদের পাঠ শেষ করিয়াছেন। শীঘ্র অবশিষ্ট দর্শন এবং আরও ৪ খানি উপনিষদ পাঠ করিবেন। অপর দিকে ইংরাজী সাহিত্য, গণিত, অর্থ ব্যবহার এবং জড়বিজ্ঞানের বিভিন্ন কয়েকটী বিষয়েও ইউনিভার্সিটির অধীনে বহু কলেজের ছাত্রগণ অপেক্ষা, বহু অল্প ব্যয়ে ও অল্প সময়ে অধিকতর শিক্ষালাভ করিয়াছেন। চরিত্র গঠন, জীবনে ধর্ম্ম অভ্যাস, গুরুকুলের শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। অষ্টমবর্ষ বয়সে বালকেরা বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হয়। বিদ্যার্থিগণের অভিভাবকেরা প্রতিশ্রুত হন যে, পঁচিশ বৎসর বয়স পূর্ণ না হইলে কেহ আপন বালককে অন্যত্র নিতে পারিবেন না, এবং বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ করাইতে পারিবেন না। এই ষোড়শ বর্ষকাল কোন বালক বাড়ীতে পত্র লিখিতে কিম্বা বাড়ীর কোন পত্র পাঠ করিতেও পায় না। অভিভাবকেরা প্রতি বৎসর দুই বার আসিয়া বালকগণকে দেখিয়া যাইতে পারেন। খেলার সময় ছাত্রেরা শাদা ধুতি পরিধান করে, পাঠের সময় গৈরিক বসন পরিধান করিতে হয়। সত্য বচন, ধ্যান, প্রাণায়াম প্রভৃতি রীতিমত ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। বৈষয়িক প্রসঙ্গ, বিষয়ী লোকের সহবাস, বিষয়ের চিন্তা, স্ত্রীমূর্ত্তি দর্শন, নির্জ্জনে স্ত্রী জাতির সহিত অবস্থান, আলাপ ও সংস্পর্শ প্রভৃতি অষ্টবিধ বর্জ্জনীয় বিধি লঙ্ঘনের অনিষ্টকারিতা বালকগণকে বুঝাইয়া সর্ব্বদা ঐ সকল হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা করা হয়। ভগবান মনু বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মচারী এবং ব্রহ্মচারিণী মদ্য, মাংস, গন্ধ মাল্য, রস, (ব্রহ্মচারীর পক্ষে) স্ত্রীসঙ্গ এবং (ব্রহ্মচারিণীর পক্ষে) পুরুষসঙ্গ, অম্লভক্ষণ, প্রাণিহিংসা, অঙ্গমর্দ্দন,

মূত্রত্যাগ ভিন্ন সময়ে অকারণে উপস্থেন্দ্রিয় স্পর্শ,নয়নাঞ্জন, চর্ম্মপাদুকাদি অথবা ছত্রধারণ, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, ঈর্ষা, দ্বেষ, নৃত্য, গীত, বাদ্য, দ্যূতক্রীড়া, পরনিন্দা, মিথ্যাভাষণ, স্ত্রীলোকের দর্শন কিম্বা আশ্রয়, পরের অনিষ্টকরণ কিম্বা অনিষ্ট চিন্তন প্রভৃতি দুষ্কর্ম্ম সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে। সর্ব্বদা একাকী শয়ন করিবে, কদাচ বীর্য্যস্খলন করিবে না। (মনুঃ ২।১৭৭—১৮০।)

হরিদ্বারের গুরুকুল বিদ্যালয়ে শ্রীমন্মনুর এই সকল আদেশ ও নিষেধ বিধি প্রতিপালন জন্য উপদেশ ও অন্য নানা উপায়ে সাহায্য প্রদত্ত হয়। মনুস্মৃতি, বাল্মীকির রামায়ণ এবং মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব্বান্তর্গত বিদুর-নীতি প্রভৃতি যে সকল প্রবন্ধ পাঠ করিলে দুষ্টব্যসন দূরীভূত হয় এবং শিষ্ট সভ্যজনোচিত আচরণ বালকগণ শিক্ষা করিতে পারে, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হয়। বিদ্যালয়ের বালকগণের ব্যায়ামক্রীড়ারও সুন্দর ব্যবস্থা আছে। মোট কথা দেহ, মন ও আত্মার সমন্বিত উৎকর্ষসাধন জন্য সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করা হয়। প্রখরবুদ্ধি পবিত্র হৃদয় ও সুস্থ দেহের একত্র সমাবেশে উপরোক্ত বিদ্যালয়ের বালকগণ, বোধ হয়, আমাদের দেশের ছাত্রগণের আদর্শস্থানীয় হইতে পারেন।

ঐরূপ জাতীয় বিদ্যালয় যেদিন বঙ্গদেশের নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইবে, সেই দিনই আমাদের প্রকৃত আনন্দ ও গৌরবের দিন মনে করিব। এজন্য বহু অর্থের এবং বহু ভদ্র সন্তানের ঐকান্তিক যত্ন চেষ্টার প্রয়োজন। মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং মহাপ্রাণ মহম্মদ মহসিনের জন্মভূমিতে, শত শত ব্রজেন্দ্রকিশোর, সূর্য্যকান্ত এই পুণ্যকার্য্যের জন্য দান করিয়া অর্থের সদ্ব্যবহার করিবেন, ইহা কিছুমাত্র দুরাশা নহে।

এক্ষণে উপসংহার কালে আমাদের প্রবল প্রতাপান্বিত ইংরাজ রাজপুরুষগণকে বলি—আপনারাও জাতীয় শিক্ষার নামে ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন না,—কিম্বা বৃথা ভয়ে আড়ষ্ট হইবেন না। নানা স্থানের ল-ক্লাশ গুলি একে একে বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে উঠাইয়া দিলেন। এজন্য আমরা বিশেষ দুঃখিত নহি, দেশও একারণে বড় বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইল, মনে করি না। উকীল মোক্তারের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, দেশে মোকর্দ্দমার সংখ্যা দিন দিন যেরূপ ভয়ানক রূপে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, অন্ততঃ কিছুকাল উকীল মোক্তারের সংখ্যা না বাড়িলেও কিছু ভাল ফল হইতে পারে। কিন্তু প্রবেশিকা পরীক্ষায় এক ইংরাজী সাহিত্য পুস্তকের সংখ্যাই প্রায় ১৭।১৮ খানি পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। একে অধিকাংশ অভিভাবকের অর্থাভাব, তাহার উপর অধিকাংশ বালকেরও এতগুলি পুস্তক শেষ করিবার সময় এবং ক্ষুদ্রমস্তিষ্কের এত গুলির সার গ্রহণ ও সঞ্চিত করিয়া রাখিবার শক্তির অভাব। বালকের স্বাস্থ্য এবং অভিভাবকের অর্থ, উভয়ই এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার ভার বহন করিতে অসমর্থ। কলেজের বিদ্যা ত আরও বেশী মূল্যবান এবং দুষ্প্রাপ্য। সুতরাং ভদ্রসন্তানদের উপায় কি? আরও একটা কথা ভাবিয়া দেখা উচিত। এই সকল ভদ্র সন্তান যদি কোনও একটা আশ্রয় অবলম্বন করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিবার সুযোগ না পায়, তাহা হইলে এতগুলি বুদ্ধিজীবী বালক কদাচ মূর্খ হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে না। তাহা হইলেই কি দেশের অবস্থা ভাল হইবে, আশা করা যায়? কখনই

নয়। ইহাতে দিন দিন অশান্তি আরও যে বাড়িবারই আশঙ্কা।

জাতীয় শিক্ষার পুণ্য সলিলে এই তাপ দগ্ধ মৃতপ্রায় ভারতকে সুখসিক্ত করিতে না পারিলে,—আর্য্য সন্তানকে পরলোক-বিশ্বাসী কর্ম্মফল-বিশ্বাসী না করিতে পারিলে,—ধর্ম্ম-ভীরু না করিতে পারিলে—ঈশ্বর-বিশ্বাসী (God-fearing,good citizen) না করিতে পারিলে, ভারতবাসী এবং ইংরাজ, নিশ্চয় জানিবেন, কাহারও আর কল্যাণ নাই। বিকৃত ধর্ম্মপ্রভাবহীন শিক্ষায়, অধিকাংশ শিক্ষাভিমানী ভারতবাসী দিন দিন কার্য্যগত জীবনে যদি নিরীশ্বরবাদী হয়, তবে এই প্রবর্দ্ধমান অশান্তি-অনলে সকলকেই জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে হইবে। সময় থাকিতে এখনও সকলে সাবধান হউন।

নবপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যালয়-সংসৃষ্ট কোন ব্যক্তি বিশেষ যদি বিপথগামী হইয়া থাকে, এরূপ সন্দেহ হয়, নীতি-ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ,—শিষ্ট সমাজ বিগর্হিত কোন কার্য্য করিয়া থাকে, এরূপ প্রমাণিত হয়, তবে সেই দোষে জাতীয় শিক্ষা কিম্বা "জাতীয় পরিষৎ" অপরাধী কিম্বা ঘৃণিত হইতে পারে না। ব্যক্তি বিশেষ দুষ্ট, বিকৃত,ক্ষিপ্ত কিংবা কোন লোমহর্ষণ ব্যাপারে সংসৃষ্ট হইলে তজ্জন্য সমগ্র দেশ, জাতি বা সম্প্রদায় দোষী বা কলঙ্কভাগী হইবে কেন? লর্ড কেভেণ্ডিসের হত্যাপরাধে সমগ্র আইরিশ জাতিকে কেহ অপরাধী বলিবেন কি? বিচারপতি নর্ম্মাণ এবং রাজপ্রতিনিধি লর্ড মেওর শোচনীয় হত্যা কাণ্ডের জন্য ভারতবর্ষের সমগ্র মোসলমান সমাজ ঘৃণা কি সন্দেহের চক্ষে কখনও অবলোকিত হন নাই, হইবার কথাও নহে। প্রেসিডেণ্ট কার্ণো এবং প্রেসিডেণ্ট মেকলিনের প্রাণ নাশের জন্য ইউরোপ ও আমেরিকায় সভ্যজাতি নিচয় জগতের চক্ষে নৃশংস নরঘাতক বলিয়া আখ্যাত হন নাই। পাপ-পুরুষ-সংস্পর্শ বিরহিত, পুণ্যাত্ম-ময় মনুষ্য-সমাজ পৃথিবীতে কোন দেশে আছে অথবা কখনও ছিল, বিশ্বাস করি না। ভাল মন্দ নিয়াই সংসার। কিন্তু তাই বলিয়া কি সমগ্র মনুষ্য জাতি ঘৃণাস্পদ হইয়া রহিয়াছে? দোষী ন্যায়-দণ্ডে দণ্ডিত হউক, তাহাতে কেহ অসন্তুষ্ট হইবে না। কিন্তু নির্দ্দোষী চিরদিন প্রীতি ও পবিত্রতার চক্ষে অবলোকিত হউক। পুণ্য ও প্রেমময় ভগবানের অংশে যখন মানুষের জন্ম, তখন অবিচারে মনুষ্য মাত্রকে পাপাত্মা বলিয়া সন্দেহ করা কদাচ সাধুজনোচিত কিংবা ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না।

মঙ্গলময় বিধাতার নিকট আজ আমাদের এই কাতর প্রার্থনা যে, তিনি যেন সকলকে সুমতি দেন,—যেন সকলের সম্মিলিত পবিত্র শুভ ইচ্ছায়, আমাদের জাতীয় শিক্ষার নবাঙ্কুরিত এই ক্ষুদ্র তরুশাবক, অচিরে ফলাফল-বিশিষ্ট স্নিগ্ধ শ্যামল-ছায়া-সমন্বিত পরম সুন্দর শোভন এক মহীরুহে পরিণত হয়। তাঁহার কৃপা কটাক্ষে এবং শুভাশীর্ব্বাদে আমাদের সকল ক্ষুদ্রতা দূর হউক। আমাদের সকল প্রকার নৈরাশ্য, সন্দেহ, বিভীষিকা, ঈর্ষা, বিদ্বেষ, মতভেদ—সর্ব্ববিধ পাপ যেন বিশ্বরাজের বিমল জ্ঞান এবং প্রেমের পুণ্যাগ্নিতে অচিরে ভস্মে পরিণত হয়। আর্য্যবালকগণ জাতীয় শিক্ষা-সুধা-পান করিয়া আবার অমরত্ব লাভের অধিকারী হউক। বন্দেমাতরম্।

শ্রীকালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী।

অভ্যর্থনা।

সমবেত প্রতিনিধি ও সভ্য মহোদয়গণ, সর্ব্বমঙ্গলময় করুণানিধান সর্ব্বনিয়ন্তার পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া, অতি বিনীত ভাবে, অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষে, আপনাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ সহ সাদর সম্ভাষণে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আমি আপনাদের নিকট উপস্থিত। রাজসাহী রাজা মহারাজার ও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির আবাসভূমি, আজি এই রাজসাহী-সম্মিলনের আমা অপেক্ষা যোগ্যতম কেহ এই প্রীতিকর কার্য্যের ভারগ্রহণ করিলে অতি সুখের ও সঙ্গত হইত। আমার এই মাত্র দাবী যে, আমি আজীবন আপনাদেরই সেবক, রাজসাহী জেলার এক প্রান্তে আপনারা বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া, জেলার হিত কার্য্যের আলোচনা জন্য শুভাগমন করিয়াছেন, এজন্য আমরা আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞ। আমাদের সেই কৃতজ্ঞতা বিনীত ভাবে আপনাদিগকে কেবল বাক্যের দ্বারা জানান ভিন্ন উপযুক্ত অভ্যর্থনার আমাদের কিছুই নাই, আপনাদিগকে নানা কষ্ট পাইতে হইবে, তজ্জন্য আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আপনারা আমাদের দরিদ্রোচিত অভ্যর্থনা গ্রহণে আমাদিগকে কৃতার্থ করুন।

বিগত ১৩১৪ সালের প্রারম্ভে রামপুর-বোয়ালিয়ায় রাজসাহী জেলা সমিতির প্রথম অধিবেশন হয়, যে উৎসাহ ও যেরূপ ধূমধামে তাহা সম্পন্ন হইয়াছিল, যাঁহারা তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা তাহা রাজসাহীর নবযুগ বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন এবং ভাবী মঙ্গলজনক বহু আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন। বিধাতার ইচ্ছায়, তাহার অতি অল্প কাল পরেই বাঙ্গালার নূতন বিভাগের অন্যান্য স্থানের ন্যায়, রাজসাহীতে যে ভীষণ কাণ্ডের অভিনয় হইয়া গিয়াছে, তাহা আপনারা সকলেই জানেন। ঈশ্বরানুগ্রহে সে অশান্তির অনেকটা এখন প্রশমিত হইয়াছে। কেন এরূপ ঘটিয়াছে, তাহা আলোচনার এ স্থান নহে, সে অতীত দুঃখ-স্মৃতির পুনরালোচনা বাঞ্ছনীয়ও নহে, বরং যত সত্বর তাহা সকলের হৃদয়পট হইতে দূরীভূত হয়, তাহাই মঙ্গলজনক। ইহার উল্লেখ এইজন্য করিতে বাধ্য হইলাম যে, এই অভাবনীয় দুর্ঘটনায় গত বৎসরের সকল উদ্যম, সকল আশা নির্মূল-প্রায় হইয়াছিল। আমার পরম স্নেহাস্পদ সোদর-প্রতিম, দেশের সেবকাগ্রগণ্য, স্বার্থত্যাগী, পরদুঃখকাতর শ্রীমান সারদাচরণ মজুমদারের ও নওগাঁর কৃতবিদ্য কয়েকটী ব্যক্তির আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টায় বহু বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া, মৃতপ্রায় রাজসাহী-সমিতির এই দ্বিতীয় অধিবেশনের অনুষ্ঠান করা হইয়াছে। আপনাদের অনুগ্রহে তাঁহাদের সে যত্ন ও চেষ্টা সার্থক হইলে, আমরা কৃতার্থ হইব। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি এবং আপনারা সকলে আশীর্ব্বাদ করুন শ্রীমান সারদাচরণ দীর্ঘজীবী হইয়া অধঃপতিত দেশের অশেষ মঙ্গল সাধন করিতে তৎপর ও সমর্থ হউন। বঙ্গমাতা শত শত সারদাচরণ-প্রসবিনী হইয়া ধন্যা হউন।

অতি দুঃসময়ে আমরা আপনাদিগকে আহ্বান করিয়াছি। খাদ্যাগার রাজসাহীর

বরেন্দ্রভূমি আজ শ্মশানাকার ধারণ করিয়াছে। দরিদ্র কৃষককুলের মধ্যে হাহাকার রব উঠিয়াছে। স্বদেশবৎসল অমর কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের শোক-গীতি "তুমি কেবল চাষের মালিক, গ্রাসের মালিক নয়" তাহাদের ঘরে ঘরে মর্ম্মভেদী রবে প্রধ্বনিত হইতেছে। এক বৎসরের শস্যহানির এই ভয়ানক পরিণাম চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই চিন্তার বিষয়। এবৎসরের বিশেষত্ব এই যে, অন্নকষ্টের সঙ্গে জলকষ্ট ভীষণতর আকার ধারণ করিয়াছে। ধান্য রক্ষার চেষ্টায় পুষ্করণী আদিতে যাহা-কিছু জল সঞ্চয় হইয়াছিল, তাহা নিঃশেষপ্রায় হইয়াছে। ভীষণ দুর্ভিক্ষ রাক্ষস করাল বদন বিস্তার করিয়া একমাত্র ধান্যপ্রাণ বরেন্দ্র ভূমিকে যেন গ্রাস করিতে অগ্রসর হইতেছে। বরেন্দ্র-ভাগ্যে এবার কি হৃদয়বিদারক দুঃখের অভিনয় হইবে, সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানই জানেন। এই ভাবী বিপদাশঙ্কায় ব্যাকুলতার মধ্যে আপনাদিগকে আমরা স্মরণ করিয়াছি। এ অবস্থায় সর্ব্বত্রই আমাদের ত্রুটী পরিলক্ষিত হইবে। আপনাদের সমবেত মাভৈঃ শব্দে আশ্বস্ত হইয়া, আমরা এই জীবন-সমরে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইতে পারিব, এ আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আমরা আজ আপনাদের শরণাপন্ন।

আত্ম শক্তির প্রসার করাইয়া, প্রজা-শক্তিকে পরিপুষ্ট করতঃ সভ্য জগতের সমকক্ষ করা, রাজশক্তির চরম উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষ স্বাধীনতাপ্রিয় সভ্য জগতের সর্ব্ব প্রধান ইংরেজ রাজের সংশ্রবে ও অধীনে আসিয়া, ইংরেজী সাহিত্য, ইতিহাসে, বিজ্ঞানে শিক্ষিত দীক্ষিত হইয়া, ইংরেজ-পথ-প্রদর্শিত সভা সমিতিতে মিলিত হইয়া, জাতীর সুখ দুঃখ, অভাব উন্নতির আলোচনা করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহাই ভারতগবর্ণমেণ্টের একটী গৌরবের কথা। বিধি বিড়ম্বনায় রাজপুরুষগণ এই নবশক্তির চালক হইতে পারেন নাই, ইহা আমাদের দুর্ভাগ্য। ভারতের চিরপ্রসিদ্ধ রাজভক্তি অন্য দেশে অনুকরণীয়। রাজকর্ম্মচারীদের ব্যক্তি বিশেষের দুর্ব্বলতা-জনিত বিচার ও কার্য্য-বিভ্রাটে বিকৃত-মস্তিষ্ক অপরিণত বয়স্ক ব্যক্তি বিশেষের অসংযত চেষ্টা ও ঔদ্ধত্য ও অপরিণামদর্শিতা সমস্ত জাতির কার্য্য-পরিচারক নহে ও হইতে পারে না। যে রাজশক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতে নবযুগের অবতারণা হইতেছে, ভারত তাহার বিরোধী কদাচ হইতে পারেনা, সিপাহী যুদ্ধের সামরিক বিলোড়ন তাহার জলন্ত প্রমাণ। রাজশক্তি ও প্রজাশক্তি একই শক্তির বিভিন্ন বিকাশমাত্র, উভয়ের সম্যক্ স্ফুরণ ও সামঞ্জস্যে শক্তির চরিতার্থতা ও সকল মঙ্গল সাধিত হয়, কিন্তু বিরোধে ও সংঘর্ষণে শক্তির অপচয় ও কার্য্যকারিতার অভাব ঘটে। যখনই যে দেশে তাহা ঘটিয়াছে, তখনই সে দেশ শক্তির খর্ব্বতা জন্য নানা অশান্তিময় হইয়া উঠিয়াছে।

রাজা ঈশ্বর-প্রেরিত বলিয়াই ভারতীয় ধারণা। হিন্দুর আদর্শ রাজা ঐশ্বরিক গুণ-সম্পন্ন, সর্ব্বভূতে সমদর্শী, শিষ্টের পালনকর্ত্তা ও দুষ্টের দমন-কর্ত্তা। ভারতের আদর্শ রাজা পিতৃস্থানীয়, প্রজারঞ্জনে ও প্রজার মঙ্গল-সাধনে সর্ব্বদা তৎপর এবং আত্মত্যাগী। অমর কবি কালিদাস বহু শতাব্দী পূর্ব্বে দিলিপের রাজত্ব বর্ণনে লিখিয়াছেন, রাজা দিলিপই সর্ব্বথারূপে তাঁহার প্রজাবর্গের পিতা ছিলেন ও তদ্রূপ কার্য্য করিতেন; তাহাদের নিজ পিতা কেবল জন্মদাতা মাত্র ছিলেন। নিরক্ষর কৃষিজীবী প্রজা আজিও রাজা জমিদারকে

পিতা বলিয়াই জ্ঞান করে। ইহা আদিমাবস্থার সরলতা নহে। বংশ পরম্পরায় ভারতে যে উদার রাজনীতি কীর্ত্তিত ও ঘোষিত হইয়া জনসাধারণের অস্থিমজ্জাগত হইয়া সাধারণ সংস্কারের ন্যায় হইয়াছে, এই জ্ঞান তাহারই বিকাশ মাত্র। সভ্যতার অভিমানে ও গরিমায় আমরাই তাহা অজ্ঞানতার কার্য্য মনে করিয়া থাকি।

এই সার্ব্বজনীন, উদার আদর্শ—রাজনীতি অবলম্বনে রাজকার্য্য পরিচালিত হইবার ঘোষণা করিয়া, অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে, সদাশয়া ভারত-সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতীয় রাজন্যবর্গ ও প্রজাবৃন্দ বহুশতাব্দী-ব্যাপী রাষ্ট্রবিপ্লবে ক্লিষ্ট থাকায় মাতৃ ক্রোড়ে স্থান পাইলেন বলিয়া আশ্বস্ত ও উৎসাহান্বিত হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডের প্রজাবৃন্দ স্বদেশ-প্রেমের সংঘর্ষণে ভারত-শাসনের মূল নীতি হইতে সময়ে সময়ে বিচলিত হইলেও, সে নীতি প্রকাশ্যে কখন পরিত্যক্ত হইয়াছিল না।

অবাধ বাণিজ্য-নীতি প্রবর্ত্তিত হইবার সময়ে লবণ ও কাপাসের সূতা সম্বন্ধে দেশীয়দের উপর যে নামান্তরিত শুল্ক আদায়ের বিধি করিয়া, বিলাতবণিকদের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহা ভারত-গবর্ণমেণ্টের চরিত্রের কলঙ্ক। রাজবিধি প্রজার মঙ্গলজনক করিতে হইলে, ভারত সম্রাট যে কোন দেশেরই অধিবাসী হউন না কেন, ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য বিধি প্রণয়ন সময়ে তিনি সম্পূর্ণ ভারত প্রজাবৃন্দের মঙ্গলজনক কার্য্য করিতে বাধ্য। ইংলণ্ডবাসী ইংরেজ-বণিকের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া ইংলণ্ডের রাজ কার্য্য করিতে বাধ্য। একাধারে তিনি উভয় দেশের রাজা হইয়া, একের অহিত করিয়া অন্যের হিতসাধন করিতে পারেন না, সমদর্শীতার এই সকল ব্যতিক্রমনীতি সর্ব্ব প্রাচীন ও সার্ব্বজনীন ভারতবর্ষীয় রাজনীতির সম্পূর্ণ বিরোধী, সুতরাং ভারতবাসীর ইহাতে মর্ম্মাহত ও ব্যথিত হওয়া স্বভাবসিদ্ধ। সম্প্রতি কতক দিন হইল, ভারতবর্ষে যে শাসননীতি প্রবর্ত্তিত হইতেছে, তাহাকে জনসাধারণের মনে নানা আশঙ্কার উদয় হইয়াছে, যাহাতে এই আশঙ্কা দূরীভূত হইতে পারে, রাজশক্তি ও প্রজাশক্তি পরস্পরবিরোধী ভাবাপন্ন না হইয়া উঠে, যাহাতে পরস্পর পরস্পরের বল ও সহায় হইয়া অশেষ মঙ্গল সাধিত করিতে পারে, রাজা প্রজা সকলেরই সর্ব্ব প্রযত্নে সমবেত চেষ্টায় তাহা করা কর্ত্তব্য।

জেলা-সমিতি প্রাদেশিক সমিতির শাখা হইলেও ইহার কার্য্যক্ষেত্র অতি সঙ্কীর্ণ। রাজনৈতিক আন্দোলন ইহার মুখ্য কার্য্য নহে। যে পল্লী সমাজ আমরা হারাইয়াছি, তাহার পুনরুদ্ধার সাধন করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য, কারণ আত্ম শক্তি প্রসারের ইহাই মূলভিত্তি, হিন্দু মুসলমানে মিত্রতা স্থাপনের দেশময় একটা আন্দোলন উঠিয়াছে। কথায় কথায় এখন হিন্দু-মুসলমান-বিরোধের অপকারিতার আলোচনা শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কথাটা অতি অন্তঃসারবিহীন বলিয়াই মনে হয়, পল্লী গ্রাম মাত্রেই এই অভিনব নীত ঘোষিত হইয়া অশিক্ষিত সমাজে ঘোর অন্তর্বিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছে এবং বিগত তিন বৎসর ধরিয়া নূতন বঙ্গে তাহার নানারূপ ঘোর অশান্তিজনক অভিনয় হইয়া গিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে পল্লী সমাজের ধারণা পর্য্যন্ত করা এখন আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। নানা শ্রেণীর লোকেরই পল্লীগ্রামে বাস ছিল, এখনও অনেক স্থানেই আছে, ইহাদের মধ্যে

পরস্পর যে সৌহার্দ্দ, সহানুভূতি ও আত্মীয়তার ভাব ছিল উচ্চ শ্রেণী ও নিম্নশ্রেণী মধ্যে যে কুটুম্বিতা হইত, অথচ নিজ নিজ গৌরব রক্ষা করিয়া সকলেই মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করিতে পারিত, তাহাই পল্লী সমাজের অস্থিমজ্জা, তাহারই উপর পল্লী সমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল। হিন্দু-মুসলমান-পার্থক্য কথাটার স্থানই তাহাতে ছিল না। জাতিভেদ যে দেশের সমাজ-বন্ধনের মূল মন্ত্র এবং সাম্প্রদায়িকতা যেখানে ব্যবসাগত ছিল, জাতি পার্থক্যের ঈর্ষাদ্বেষ সে সামাজিকতার অন্তরায় হইতে পারিত কি না, তাহা চিন্তার বিষয়। ব্যক্তিগত উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ সম্বন্ধে সামাজিক পালন যে অতি সুন্দর উপায়, তাহা আজি কালি অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন, সামাজিকতার জীবন্ত ভাবের উপর সেই শাসনবিধি নির্ভর করে। পল্লী সমাজে যখন সেই জীবন্তভাব ছিল, তখন নানারূপেই তাহার উপকারিতা জনসাধারণ লাভ করিতে পারিত এবং নানা পার্থক্যের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়া পল্লী সমাজকে শান্তিময় করিয়া রাখিতে পারিত, রাজবিধি এবং সমাজবিধি ক্রমে বিরোধী ভাবাপন্ন হইয়া সমাজ-বিরোধী ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির প্রশ্রয়ে সে সমাজ বন্ধন নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এবং সাম্প্রদায়িক বৈষম্য ও বিরোধ ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। অনেকেই এখন বুঝিতে পারিতেছেন, সেই সার্ব্বজনীন পল্লী সমাজের পুনঃপ্রতিষ্ঠা আত্মশক্তি প্রসারের সর্ব্ব প্রথম কার্য্য এবং সে উদ্যমে সফলতা হইলেই, আমরা নানা পার্থক্য সত্ত্বেও, জাতীয় জীবন লাভে অধিকারী হইতে পারিব, ব্যক্তিগত ও সাম্প্রদায়িক পার্থক্য ও জিগীষা সর্ব্ব দেশেই আছে; সমতা রক্ষিত হইলেই তাহাতে অশেষ মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, মিলিত চেষ্টা দ্বারাই সভ্য জগৎ সেই সমতা রক্ষা করিয়া জাতিগত উন্নতি সাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছে।

যে সকল বিষয় আপনাদের নিকট আলোচনা করার জন্য উপস্থিত করা হইবে, তাহার সর্ব্ব প্রধান, দুর্ভিক্ষ ও স্বাস্থ্য-রক্ষা কারণ ইহারই উপর ব্যক্তি বা জাতিগত উন্নতি অবনতি নির্ভর করে, দেহ ও মনের স্ফূর্ত্তি সাধন, পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও মৃত্যু সংখ্যার যতদূর সম্ভব হ্রাস করিতে পারা, এই কয়টী স্বাস্থ্য রক্ষার উপাদান। কি উপায়ে এই কয়টী বিষয়ের সুব্যবস্থা করা যায়, ইহাই আমাদের বিবেচ্য বিষয়। বাঙ্গালার জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু সংখ্যার হার, বিশেষতঃ শিশু মৃত্যু সংখ্যার হার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। গত বৎসরে পাবনা প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি স্বদেশবৎসল পরম শ্রদ্ধেয় ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় এই বিষয় আলোচনা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর সকল কার্য্যের ন্যায়, আর তাহার উত্তর শুনা যায় নাই। মৃত্যু সংখ্যার প্রকৃত আলোচনা হইলে সে সমাজের সুখ দুঃখের প্রায় সকল অবস্থাই জানিতে পারা যায়, রাজপুরুষেরা এ সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন নহেন, কিন্তু যে অনুসন্ধান দ্বারা ইহার কারণ স্বীকৃত করা যাইতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত আজিও করা হয় নাই।

নানা দিকেই আমাদিগের অবনতি ঘটিয়াছে, কিন্তু কি জন্য তাহা ঘটিল, তাহার অনুসন্ধান না হইলে উন্নতি লাভের আশাই বৃথা। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু সংখ্যা দিন দিন যেরূপ হ্রাস হইতেছে, ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া

তাহার প্রতিকার করিতে না পারিলে আর এক শতাব্দী পরে কি ঘটিবে, ঈশ্বরই জানেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এবিষয়ে নীরব নহে। দুঃখের বিষয়, তাহা স্কুল কলেজের সাধারণ পাঠ্যের অঙ্গ নহে। জাতীয় শিক্ষা বিভাগের এই গুরুতর বিষয়টী হস্তে লওয়া নিতান্ত আবশ্যক। প্রত্যেক জেলা সমিতির সাহায্যে, প্রতি জেলার সামাজিক ইতিহাস সংগ্রহ করা অতি সহজ। গবর্ণমেণ্ট ফৌজদারী বিভাগে, এখন জেলে জেলে যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান লইতেছেন, সর্ব্বসাধারণ সমক্ষে সেইরূপ প্রণালীতে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সাহায্যে বিবরণ সংগ্রহ করা আবশ্যক। বিশুদ্ধ হিন্দু রীতিনীতি যে বিজ্ঞানসম্মত এবং দেশহিতকর, তাহা এখন ক্রমে প্রমাণীকৃত হইতেছে। ইহা দ্বারা এই অনুমান হয়, এব সময়ে আর্য্য-ঋষিগণ এবিষয়ের সম্যক আলোচনা করিয়াই হিন্দু রীতি-নীতির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এই অনুমান সত্য হইলে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সম্মিলন ভূমি ভারতবর্ষই এই অনুসন্ধান-কার্য্যের নেতা হইবার উপযুক্ত। ভারতের এই লুপ্ত-গৌরব উদ্ধার হইলে পুনরায় ভারত -সভ্য জগতে উচ্চ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইবে, ইহা দুরাশা নহে। আমার পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু সাহিত্য জগতে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম-এ, বি-এল মহোদয় জন্ম মৃত্যুসম্পর্কে যে বিবরণ আমাকে দিয়াছেন, তাহা আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি। ১৯০৫, ১৯০৬ ও ১৯০৭ সালের বাঙ্গালায় জন্ম মৃত্যুর হার যাহা জানা গিয়াছে, তাহা এই—

	১৯০৫	১৯০৬	১৯০৭	
জন্ম—	৩৯'৫	৩৭	৩৩	প্রতি হাজারে
মৃত্যু—	৩২	—	৪০	ঐ
শিশু-মৃত্যু	—	—	৩৬	ঐ

ইহা দ্বারা দেখা যাইতেছে, গত তিন বৎসরে জন্ম সংখ্যা ক্রমে কমিয়া যাইতেছে ও মৃত্যুসংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ১৯০৭ সালে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুসংখ্যা বেশী হইয়াছে এবং তিন বৎসর পূর্ব্বে যাহা জন্ম ও মৃত্যুর হার ছিল, তাহাই তিন বৎসর মধ্যে সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়াছে। অন্যদেশের, শিশু মৃত্যুর হার হাজারে ১৫ হইতে ২০ মাত্র, কিন্তু বাঙ্গালায় তাহা ৩৬। গত ১৯০৭ সালে বাঙ্গালায় কিঞ্চিদধিক সাড়ে এগার লক্ষ লোকের মৃত্যু হইয়াছে, ইহার শতকরা ৬২ জন মেলেরিয়া রোগে মরিয়াছে। গত পঞ্চাশ বৎসরে হিন্দুসংখ্যা শতকরা ৪০জন কমিয়াছে। এই ভাবে চলিলে আর এক শতাব্দী পরে কি ঘটিবে, চিন্তা করিতেও হৃৎকম্প হয়। নব্যভারত ও সাহিত্যে শশধর বাবু "পরবশতা", "ভাব ও কর্ম্ম" "আত্মরক্ষা" প্রভৃতি যে সকল পাশ্চাত্য জগতে গৃহীত গভীর গবেষণা-পূর্ণ প্রবন্ধ লিখিতেছেন, তাহা সকলেরই বিশেষ বিবেচনার বিষয়। তিনি যেরূপ অধ্যবসায়ে জীবতত্ত্ব ও তদনুষঙ্গিক বিজ্ঞান ও সামাজিক ইতিহাসাদি, ভারতের অমূল্যধন উপনিষদাদি গ্রন্থাদির সহিত মিলিত করিয়া অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ ও আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং অনুকরণীয়। অনেক সময় তাঁহার সহিত এই সকল বিষয়ের আলোচনায় আমার ধারণা হইয়াছে, জীবতত্ত্বের এবং সামাজিক ইতিহাসের সম্যক্ আলোচনা ও শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষার বিষয় এবং সেই শিক্ষাভিত্তির উপর সমস্ত শিক্ষা-পদ্ধতি স্থাপন করা কর্ত্তব্য। জাতীয় শিক্ষা বিভাগে এই বিষয়টী বিশেষরূপে আলোচিত হওয়া এবং তদনুসারে কার্য্যের ব্যবস্থা হওয়া একান্ত প্রার্থনীয়

জন্ম মৃত্যুর বিবরণ আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে, আমাদিগের অবনতির কারণ অনুসন্ধান জন্য দৈহিক ও যান্ত্রিক পরিমাপ, শিরা ও পেশীর শক্তি পরীক্ষা, মানসিক শক্তি পরীক্ষা প্রভৃতি শিক্ষার অঙ্গ হওয়া আবশ্যক এবং তাহার সাহায্যে প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিয়া মূল ব্যাধির প্রতীকারের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এদিকে সাধারণতঃ মেলেরিয়া নিবারণ জন্য পচা নালা ডোবা পূরণ করা,জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া পবিত্রকর বাতাস ও রৌদ্রের সুগম করিয়া দেওয়া, পানীয় ভাল জলের ব্যবস্থা করা,বলরক্ষা করা ও বল বৃদ্ধির উপায় অবলম্বন করা, পুষ্টিকারক আহারীয় সংগ্রহ করা প্রভৃতি কার্য্যের সুব্যবস্থা করা আবশ্যক, কিন্তু এই সকল কার্য্যেরই মূল ধনবল বৃদ্ধি করা। কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতি ভিন্ন ধনবল বৃদ্ধি হইতে পারে না। প্রায় সকল সভ্যদেশেই কৃষি ও বাণিজ্য রাজশক্তি দ্বারা পরিপুষ্ট, ভারত গবর্ণমেণ্টও এদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, "স্বদেশী" নীতি অবলম্বনে রাজপুরুষগণ ও জনসাধারণ কৃষি বাণিজ্যের পৃষ্ঠপোষক হইলেই, ভারতবর্ষ পুনরায় স্বর্ণপ্রসবিনী হইবেন এবং ইংলণ্ডের প্রকৃত গৌরব-রক্ষিত হইবে।

জেলাসমিতির সাহায্যে পল্লীসমিতি সংস্থাপন, শঙ্করাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত মঠ স্থাপন এবং বিবাহ প্রথার পুনঃসংস্কার এই তিন প্রধান উপায়ে আমাদিগকে আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠা ও প্রসার করিতে হইবে। আপনারা আসুন,সকলের সমবেত চেষ্টায় আমরা সেই মহৎ কার্য্য সাধনোপযোগী হইয়া কৃতার্থ হই।

"স্বদেশী" ও মঠস্থাপন বিষয়ে অনেক কথাই বলিবার আছে, কিন্তু দুই একটী কথা মাত্র আপনাদিগের সমক্ষে উপস্থিত করিব। স্বদেশী কি? স্বদেশী স্বদেশ-প্রেম মাত্র, এবং স্বদেশ-প্রেম বিদেশী বিদ্বেষ নহে। পিতৃ মাতৃ সেবা, অন্ধ আতুর সেবা, অতিথি সেবা, সকলই মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু তাহারও অগ্র পশ্চাৎ আছে। পিতামাতাকে ঘরে অন্নকষ্টে ক্লিষ্ট রাখিয়া কেহ বিলাসিতায় অথবা অন্য দুঃখ দূর জন্য অর্থব্যয় করিলে যেরূপ সে সকলেরই ঘৃণার পাত্র হয়,সেইরূপ, স্বদেশের দুঃখ কষ্টে তাচ্ছিল্য করিয়া বিদেশে কেহ অর্থব্যয় করিলে, সে সকলেরই নিন্দাভাজন হয়। বিদেশী বর্জ্জন ও স্বদেশী গ্রহণ, ইহাই মূল নীতি। রাজা জমিদারদের নিজপল্লী ছাড়িয়া ব্যয়-সাধ্য দূর সহরে বাস গবর্ণমেণ্টও নিন্দা করেন। স্বদেশজাত দ্রব্য পাইলে বিদেশী দ্রব্য লওয়া হইবে না, পূর্ত্তকার্য্য বিভাগে গবর্ণমেণ্টের এইরূপ আদেশ আছে। এই নীতি সাধারণে গৃহীত হইলে গবর্ণমেণ্ট কেন তাহার পৃষ্ঠপোষক হইবে না, তাহার কোন কারণ নাই। আমরা যে দোকানে সর্ব্বদা জিনিস পত্র লই, সে দোকানী অন্যত্র প্রাপ্য জন্যও তাগাদা করিয়া ত্যক্ত করিলে বা ঋণ গ্রহণে তাহার দেনা শোধ করিতে বাধ্য করিলে, স্বতঃই আমরা তাহার দোকানে জিনিস লওয়া বন্ধ করি। বঙ্গভঙ্গে ভাবী উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত হওয়া বিশ্বাসে বঙ্গবাসী ক্লিষ্ট ও বিড়ম্বিত হইয়া ভারতরাজ্য-বিধাতা প্রজাতন্ত্র রাজ্যের বণিক সম্প্রদায়ের সহানুভূতি না পাইয়া ও তাহাদের উদাসীনতা জন্য বঙ্গবাসী তাহাদের সহিত ক্রয় বিক্রয় বন্ধ করিয়া কোন দোষের কার্য্য করে নাই। বাণিজ্যের উন্নতি সাধন দেশের ধনবৃদ্ধির এক মাত্র উপায়, ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। সুতরাং স্বদেশীই আমাদের উদ্ধারের একমাত্র আশ্রয়।

উপায়। শঙ্করাচার্য্য-প্রতিষ্ঠিত মঠপ্রথা প্রচার কার্য্যের পরম সহায়। চিরকুমার অথবা আশ্রমবাস পর্য্যন্ত অবিবাহিত, সচ্চরিত্র, পরহিত-ব্রত, ধর্ম্মনিষ্ঠ, স্বার্থত্যাগী ব্যক্তি নির্ব্বাচন করিয়া তদ্দ্বারা পরিচালিত পল্লী-আশ্রম অথবা মঠ স্থাপন করা আবশ্যক হইয়াছে। ঐ আশ্রম অথবা মঠের সাহায্যে পল্লীসমাজে জ্ঞান,ধর্ম্ম ও শিক্ষা প্রচার, স্বাস্থ্য বিধান, দৈহিক,মানসিক ও আর্থিক বলবৃদ্ধির জন্য ব্যায়াম, শাস্ত্রালোচনা ও ব্যবসায় বাণিজ্যাদির উন্নতি বিধান ও পরোপকার ব্রত, আত্মরক্ষা ও সমাজরক্ষা ও তাহার উন্নতি বিধান প্রভৃতি দৈনন্দিন সদনুষ্ঠান শিক্ষার ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক। এইরূপ এক একটী আশ্রম, বিবিধ সদনুষ্ঠান পল্লীমধ্যে চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত করিবে, পল্লী বহুকালের নিদ্রালসভাব হইতে জাগ্রত হইবে, এরূপ আশা করা যাইতে পারে, সন্দেহ নাই।

এক্ষণে সভাপতি নির্ব্বাচন করা আপনাদের প্রথম কার্য্য। যাঁহাকে (শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরীকে) আপনারা সেই পদে মনোনীত করিয়া আহ্বান করিয়াছেন, তিনি আপনাদেরই একজন। অল্প দিন পূর্ব্বে তিনি আমাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। তাঁহার ন্যায় স্বদেশবৎসল, স্বদেশসেবক, রাজসাহীর পরম বন্ধু পাওয়া দুর্লভ। রাজসাহীর ম্যালেরিয়া নিবারণ ও অন্যান্য হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান জন্য আইন সভায় তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। নাটোর মহকুমার মৃত্যু সংখ্যার হার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, ইহা তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে প্রথমে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টিপথে উপস্থিত করিয়া প্রতিকারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। আজিকার এই শুভ কার্য্যের নেতা তাঁহাকে করিতে পারা আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয়। আমি আর আপনাদের সময় নষ্ট করিব না। আমার সকল ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন, এই আমার শেষ প্রার্থনা।

শ্রীকিশোরীমোহন চৌধুরী।

কবিবর নবীনচন্দ্র সেন।

জন্ম—১২৫৩ সাল, ২৯শে মাঘ, বুধবার, নয়াপাড়া গ্রাম।
মৃত্যু—১৩১৫ সাল,১০ই মাঘ, শনিবার, চট্টগ্রাম - লক্ষ্মীভিলা।

যে সকল মহাত্মার পূতনাম স্মরণে বঙ্গভাষা আজ গৌরবান্বিত, তাঁহাদের মধ্যে নবীনচন্দ্র অন্যতম। তাঁহার তিরোধানে আজ বঙ্গে হাহাকার উঠিয়াছে।

ভারতচন্দ্রের বীণার ঝঙ্কার যখন নীরব হইয়াছিল, তখন বঙ্গে একবার মহা হাহাকার উঠিয়াছিল। আর কি এমন সরস লেখা বাহির হইবে, সেই সময়ে অনেকের মুখেই এই কথা প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। আবার যে বঙ্গ প্রাণ মাতোয়ারা বীণার ঝঙ্কারে পরিপূরিত হইবে, তাহা কে জানিত? ধন্য মধুসূদন, ধন্য হেমচন্দ্র, ধন্য নবীনচন্দ্র—তাঁহারা তিনে এক, একে তিন হইয়া,সেই দুর্দ্দিনে, মাতৃভাষার সিংহাসন মস্তকে ধারণ করিলেন;—মুমূর্ষু বঙ্গবাসী—কোকিল-কূজন শুনিয়া বিস্মিত নয়নে, স্থির

বদনে, উৎফুল্ল হইয়া চাহিয়া দেখিল, বঙ্গের দিন ফিরিয়াছে। এমন এক সুধাবিনিন্দিত ভাষার স্রোত বহিয়া গেল, যাহার সমতুলা আর বঙ্গে হইবে কিনা, জানি না। সকলে আত্মহারা, সকলে প্রমুগ্ধ, সকলে সম্মোহিত! সকলের মুখে এই এক ধ্বনি,—কি শুনিলাম, কি দেখিলাম!! সকলে বুঝিলেন, বঙ্গভাষার ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল। যাঁহারা বিদ্রূপের নির্ম্মম কশা হস্তে লইয়া বঙ্গভাষাকে সদা কঠোর আঘাত করিতেন এবং ইংরাজি ভাষার বুকনি উচ্চারণে রসনাকে তৃপ্ত করিতেন, তাঁহারাও থমকিয়া দাঁড়াইলেন এবং লজ্জিত হইয়া ভাবিলেন, কাব্য-জগতে আবার মিল্টন, আবার কাউপার, আবার বায়রণ ফিরিয়া আসিলেন কি? উঁহারা অন্নে কি সে দিন সাহিত্য-পরিষদে যোগ দিয়াছেন? যখন লজ্জার উপর লজ্জা রাখিবার আর ঠাঁই পাইলেন না,—তখন বুঝিলেন, এবং স্বীকার করিলেন, বাঙ্গালা ভাষার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল! তাঁহারা অন্নে কি আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষার প্রবর্ত্তনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন? সে সকল কাহিনী স্মরণ করিলে চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যায়,— অনেক বিদ্রূপ-বাণ, অনেক ঠাট্টা কশা নিক্ষেপের পরও যখন দেখিলেন—এ বালিকা কিছুতেই মরে না, সর্ব্বপ্রকার সহানুভূতি এবং সাহায্য-বঞ্চিতা হইয়াও এ বালিকা নানা বেশ ভূষায় অপূর্ব্ব সাজে সাজিয়া দাঁড়াইতেছে, তখন, আর কি করেন, সম্মোহিত অন্তরে, না জানি কি মর্ম্মবেদনার দাহনেই (!) হাসিমুখে বালিকাকে অভিভাষণ করিলেন!! মলিনার আজ সর্ব্বত্র আদর, আজ কুরূপার প্রতি সকলের সাদর আহ্বান ও প্রীতি-সম্ভাষণ দেখিয়া শুনিয়া, ভাই, তুমি কি মনে করিতেছ? ঠাকুরদাস ও বিহারীলাল আজ স্বর্গে, ভূদেব এবং রাজকৃষ্ণ আজ বৈকুণ্ঠে—মলিনার সাদর-অভ্যর্থনা দেখিয়া কে আজ নিভৃতে নৃত্য করিবেন? হায়, আজ নবীনচন্দ্রও স্বর্গে—কুরূপার সাদর অভিভাষণ দেখিবার জন্য প্রাচীন যুগের আর কে রহিলেন?

মধুসূদন বড়, না হেমচন্দ্র বড়, না নবীনচন্দ্র বড়—সে কথা বিচারের সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনে এক, একে তিন। যেমন অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর এবং প্যারীচাঁদ, যেমন বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র এবং দেবেন্দ্রনাথ, যেমন রাজকৃষ্ণ, ভূদেব এবং রাজনারায়ণ,—তেমনই, মধুসূদন, হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্র। মলিনার সেবা করিবার সময়, এদেশের মহারথীরা, তন্ময় হইয়া জাতি, কুল অবস্থার গণ্ডি ভুলিয়া গিয়াছিলেন,—পরস্পর একাত্মক হইয়া, এক-ধ্যান, এক-জ্ঞান, এক রস-সুধাপানে বিভোর হইয়াছিলেন। তাঁহারা এমন মধুর মিলনে মিলিয়াছিলেন যে, ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক, মূর্খ জ্ঞানী, বৈদ্য কায়স্থ ব্রাহ্মণ, পূর্ব্ববাঙ্গালা পশ্চিম বাঙ্গালা —সব ভেদ ভুলিয়া মলিনার প্রেমে বিভোর হইয়াছিলেন। চট্টগ্রাম, যশোহর, হুগলি, ২৪ পরগণা—সব মিলিয়া একাকার। এরূপ সুন্দর দৃশ্য কেহ কখনও দেখে নাই; ভেদ-বুদ্ধি ও অহংজ্ঞানের প্রাবল্যের দিনে, এদেশে, আর কেহ কখনও দেখিবে কি না তাহাও জানি না। ধন্য বঙ্গভূমি, ধন্য বঙ্গভাষা! সব যখন একাকার, তখন কাহার আদর অধিক হইবে? যূঁই, বেলী, চামেলী—কে কার অপেক্ষা হীন? সকলেরই এক মহাব্রত ছিল, বাঙ্গালা ভাষাকে উদ্ধার করিতে হইবে। কি কঠোর সাধনা বলেই তাঁহা

তাঁহারা করিয়া গিয়াছেন! এই পবিত্র ব্রত পালনে, দুঃখ দারিদ্র্য সব তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং এই মলিনার উদ্ধারের কথা ভাবিবার সময়, কেহ যেন কখনও ভেদ-গণনা করেন না,—সকলেই যেন মনে রাখেন, উঁহাদের সকলেরই প্রয়োজন ছিল, তাই তাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা গাহিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা মাতিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই সমানভাবে বিভোর হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই এক ধ্যান, এক-জ্ঞান, এক-রস-সুধাপানে বিভোর হইয়াছিলেন। কত তপস্যার ফলে আজ বঙ্গে মলিনার বিকাশ হইয়াছে, ভাই, তুমি একবার চিন্তা কর এবং যদি তোমার চক্ষে ভক্তির অশ্রু জমিয়া থাকে, তবে তাহা আজ, প্রীতি-অর্ঘ্য সহ নবীনচন্দ্রের পূত শ্মশানে ঢালিয়া দেও। চট্টগ্রাম আজ স্বর্গে এবং কর্ণফুলী আজ ভক্তি-নদীতে পরিণত হউক।

বঙ্গের মহা-সমস্যা—ভেদ-বুদ্ধির বিনাশ। তাঁহারা বঙ্গে, শুধু বঙ্গে কেন, ভারতে আবার ভেদ-জ্ঞানের রাজত্ব স্থাপনে বদ্ধপরিকর;— আমরা ভেদ জ্ঞান-বিনাশে সচেষ্ট। নির্য্যাতন, নির্ব্বাসন, নিপীড়ন—এ সকল গণিয়া কি আমরা ফিরিব? কই, যাঁহারা সাহিত্যের নেতা ছিলেন, তাঁহারা ত ফিরেন নাই,—বঙ্গ-ভাষার মহা সাধকেরা ত ভয়ে ভয়ে সন্ত্রস্ত হন নাই? তবে আমরা, কাপুরুষের ন্যায়, কি মহারথীদের কথা ভুলিয়া, পাচাটা পোষ্যপুত্রদের দলে নাম লিখাইব? যদি তাহা হয়, তবে আর কেহ মহারথীদের নাম মুখে আনিও না। ভুলিয়া যাও—

"কোথা যাও, ফিরে চাও, সহস্র কিরণ,
বারেক ফিরিয়া চাও ওহে দিনমণি,
তুমি অস্তাচলে দেব করিলে গমন,
আসিবে ভারতে চির বিষাদ রমণী।"

এবং এ ভারতকে গাঢ় বিষাদ-অমাবস্যায় আবার গ্রাস করুক। কিন্তু তাহা কি আর সম্ভব? জাগরণের পথ রোধ করে, কাহার সাধ্য? চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে, সভয়ে আজ লিখিতেছি, তাহা সম্ভব নয়—মলিনা যদি অপূর্ব্ব সাজে সাজিয়াছে, তবে জোয়ান-অব-আর্কের ন্যায়, এই মলিনাই ভারতকে জয় করিবে, তুমি, আমি, সে, তাহার বিরোধী হইলে আমরাই পচিয়া ডুবিয়া মরিব, মলিনার তেজোগর্ব্বে ভারত জাগিবেই জাগিবে। আর আমরা যদি তাহার সেবা, তাহার পরিচর্য্যা, তাহার সাদর সম্ভাষণ লইয়া থাকিতে পারি, আমরাও তাহার সহিত ধন্য হইয়া যাইব। বিশ্ববিধাতা এই আশীর্ব্বাদ করুন, বঙ্গভাষা ভারতের সর্ব্বত্র আদৃত হউক এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গের মহারথীগণ সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত ও আদৃত হউন!

দারুণ শোকের দিনে নবীনচন্দ্র সম্বন্ধে আর অধিক কিছু লিখিতে পারিলাম না,— লিখিতে ইচ্ছাও নাই, কেননা, ৪০ বৎসরের বঙ্গসাহিত্যে যে নবীনচন্দ্রের প্রতিভা ওতপ্রোতভাবে বিমিশ্রিত, তাহা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইবার নয়। নবীনচন্দ্রের কীর্ত্তি এদেশে অক্ষয় হইয়াছে। অনন্তকাল তাঁহার প্রতিভা-কীর্ত্তনে কৃতীগণ বিমল আনন্দ পাইবেন।

এস্থলে নবীনচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত "বঙ্গভাষার লেখক" ও "চুচুড়া-বার্ত্তাবহ" হইতে তুলিয়া দিলাম।

"১২৫৩ সালের ২৯শে মাঘ, অর্থাৎ ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারি, বুধবার, চটগ্রাম জেলার অন্তর্গত রাউজান থানার অধীন সর্ব্বজন-পরিচিত নয়াপাড়া গ্রামে তিনি জন্ম

গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বিপুল গ্রামখানির চারিদিক হীরক হারের ন্যায় নদীর দ্বারা বেষ্টিত এবং চট্টগ্রাম সহর হইতে ৮ মাইল দূরে অবস্থিত। নবীনচন্দ্রের মৃতদেহ নৌকাযোগে চট্টগ্রাম হইতে নয়াপড়া গ্রামে সংকীর্ত্তন দল সহ লইয়া যাওয়া হইয়াছিল এবং তাঁহার জন্মস্থান নয়াপড়া গ্রামের শ্মশানঘাটে তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। তাঁহার পিতার নাম ৺ গোপীমোহন রায় (সেন) এবং মাতার নাম ৺ রাজরাজেশ্বরী দেব্যা। তিনি এমন সরলা ছিলেন যে, দশের অধিক গণিতে জানিতেন না। কুলানুসারে জন্মপত্রিকালেখক লিখিয়াছেন, নবীনচন্দ্র সেন দাস। নবাবদত্ত পৈত্রিক উপাধিক্রমে শৈশবে তিনি "নবীনচন্দ্র রায়" ছিলেন। কেহ কেহ বহু যত্নে বহু ক্লেশে যে "রায় বাহাদুর" উপাধি লাভ করেন, নবীনচন্দ্র তাঁহার জনৈক খুল্লতাত ভ্রাতার ভ্রান্তিতে তাহা হারাইয়াছিলেন। তাঁহার খুল্লতাত ভ্রাতা বলেন "রায়" Honorary distinction নামের সঙ্গে আপনি লিখিতে নাই।" তাই নবীনচন্দ্র বিদ্যালয়ে "রায়" কাটাইয়া "সেন" লিখাইয়াছিলেন। যে দুই বৈদ্য বংশ চট্টগ্রামের হিন্দু সমাজের উপর এতকাল আধিপত্য করিয়া আসিতেছেন, বঙ্গের গৌরব কবিবর নবীনচন্দ্র সেন তাহারই অন্যতরের সন্তান। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা "রাঢ়ভঙ্গের" সময় ষোড়শ শতাদীতে হুগলী জেলার অন্তর্গত ত্রিবেণীর সন্নিকটবর্ত্তী কোনও গ্রাম হইতে চট্টগ্রাম অঞ্চলে যাইয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করেন,—শ্রীযুক্ত রায় চট্টগ্রামের রাজস্ব ভার এবং তাঁহার ভ্রাতা শ্যাম রায় সৈন্য ভার প্রাপ্ত হন। ঢাকার নবাব তথায় শিবিরে অবস্থানকালে শ্যাম রায়ের ক্ষমতা পরীক্ষার্থ এক রাত্রিতে দীর্ঘিকা খনন করিয়া, তাহাতে পদ্মফুল দেখাইতে আদেশ করেন। সেই রাত্রিতেই শ্যাম রায় তাঁহার শিবির সমক্ষে এক বিস্তৃত দীর্ঘিকা খনন করিয়া ও নিকটস্থ কর্ণফুলী নদী হইতে তাহা জলপূর্ণ করিয়া তাহাতে পদ্মফুল ভাসাইয়া দেন। নবাব প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পর, সপদ্ম সরোবর সন্দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হন। এই সরোবর এখনও চট্টগ্রাম সহরের উপর অংশে "কমলদহ" নামে পরিচিত। শ্যাম রায়ের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রায় চট্টগ্রামের রাউজান থানার অন্তর্গত নয়াপাড়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তিনি বিশুদ্ধাচারী হিন্দু এবং সিদ্ধ ভক্ত ছিলেন। এক এক সময় তাঁহার স্থাপিত দশভুজার সমক্ষে—ইনি এখনও নবীনবাবুদের কুলমাতা—অহর্নিশি প্রণত থাকিতেন; এইরূপ প্রবাদ, মাতা স্বয়ং দর্শন না দিলে তিনি উঠিতেন না। তাঁহার প্রভুত্বে ঈর্ষা-পরায়ণ তাঁহার অন্য এক ভ্রাতা তাঁহাকে এই প্রণত অবস্থায় খড়্গাঘাতে নিহত করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা কনক-মঞ্জরী প্রতিজ্ঞা করেন, তাঁহার পিতৃব্যের মুণ্ড যদি দর্শন করিতে পারেন, তবে তিনি "বাপ খুড়া" বলিয়া ক্রন্দন করিবেন, অন্যথা কাঁদিবেন না। তাঁহার অনুচরবর্গ পলাতক খুল্লতাতকে হত্যা করিয়া তাঁহার মুণ্ড আনিয়া তাঁহাকে দেখাইয়া, তাঁহার এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন। শ্রীযুক্ত রায়ের দুই পত্নীর দুই অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র ছিলেন। রাজ্যে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা হইলে, তাঁহাদের প্রতিপালনের জন্য একটী বৃহৎ জমীদারী রাখিয়া, নবাব সমস্ত সম্পত্তি "বাজেয়াপ্ত" করেন। এই জমীদারী এখনও অংশক্রমে নবীনচন্দ্র ও তাঁহার বংশীয়দের অধিকারে আছে। তাঁহার ৯ পুরুষ নয়াপাড়া গ্রামে

বাস করিতেছেন এবং শ্রীযুক্ত রায়ের বংশ বলিয়া এ অঞ্চলে পরিচিত। এ বংশের প্রায় প্রত্যেক পতিপত্নীর নামে নয়াপাড়া গ্রামে এক একটী দীঘি কি সরোবর আছে। নবীন চন্দ্রের পিতা চট্টগ্রামের জজ আদালতের সেরেস্তাদার ও পরে মুন্সেফ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেও সংসারের ব্যয় সঙ্কুলন করিতে না পারিয়া অবশেষে ওকালতী ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরোপকারিতা ও দানশীলতা চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রবাদের মত প্রচলিত। নবীনচন্দ্রের পিতা ও পিতৃব্যগণ চারি সহোদর—গোপীমোহন, আনন্দমোহন, মদনমোহন ও ঈশ্বরচন্দ্র। নবীন চন্দ্র পিতামহ ও পিতামহীর জীবতাবস্থাতেই জন্মগ্রহণ করেন, তাই শৈশবে তাঁহার আদরের সীমা ছিল না। তিনি মাতামহীর বড প্রিয়পাত্র ও স্নেহভাজন ছিলেন। পিতামহী তাঁহাকে বাল্যকালে লালন পালন করিয়াছিলেন; সুতরাং মাতার সহিত বাল্যকালে তাঁহার বড একটা সংস্রব ছিল না।

নবীনচন্দ্র অষ্টম বর্ষ বয়সে চট্টগ্রামের গুরুমহাশয়ের পাঠশালার পাঠ শেষ করিয়া চট্টগ্রাম বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। তিনি শৈশবে বড় দুষ্ট ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন; কাহাকেও ভয় করিতেন না, কেবল খুড়া মদনমোহনকে দেখিলেই একটু শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিতেন। বিদ্যালয়ে তিনি "Wicked the great" (দুষ্টের শিরোমণি) উপাধি পাইয়াছিলেন। তাহার বাল্যজীবন কতক লর্ড ক্লাইভের মত। এমন খেলা নাই, যাহা খেলিতেন না, এমন লোক নাই—ক্ষেপাইতেন না। শেষে বিদ্যার পরিচয় পুরাতন সাহিত্য পরিষদে সম্যকরূপে দিয়া আসিয়াছেন। নবীনচন্দ্রের একাদশ বৎসর বয়সে তাঁহার খুড়া মদনমোহনের ওলাউঠায় মৃত্যু হয়। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে নবীনচন্দ্র চট্টগ্রাম বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা, প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এফ-এ এবং জেনারেল এসেম্বিলি হইতে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। যেমন তিনি এক একটী পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন, অমনি লোকে স্তম্ভিত হইয়া বলিতে লাগিল, এমন দুষ্ট ছেলে কিরূপে পাশ হইল? বিদ্যালয়ের পণ্ডিত মহাশয় নবীনচন্দ্রের দুষ্টামিতে উৎপীড়িত হইয়া বলিতেন—"গোপীবাবু মাঘ মাসের শীতে এক গলা জলে তপস্যা করিয়া এমন পুত্র পাইয়াছিলেন।" নবীনচন্দ্রের বিদ্যাধ্যয়নকালে, তাঁহার পিতা গোপীমোহন বাবু বদান্যতা ও আশ্রিত-বাৎসল্য বশতঃ ঋণজালে জড়িত হইয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত গৃহদাহ ও পৈত্রিক সম্পত্তি লইয়া জ্ঞাতিদিগের সহিত মামলা মোকর্দ্দমা ও বিবাদ উপস্থিত হওয়ায়, তাঁহাদিগের অবস্থা শোচনীয় হইয়াছিল। এই সময় নবীনচন্দ্র চট্টগ্রাম বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর বৃত্তি পাইয়াছিলেন। তারপর, তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। এফ-এ, পরীক্ষা দিবার এক মাস পূর্ব্বে তাঁহার বিবাহ হয়। গোপীমোহন বাবু প্রথমে এক পাত্রীর সহিত পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করেন, কিন্তু সে পাত্রী পুত্রের মনোনীত না হওয়ায়, সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায়, তজ্জন্য ফৌজদারী মামলায় পড়িয়া গোপীমোহনকে বিপন্ন হইতে হইয়াছিল। গোপীমোহন শেষে পুত্রের মনোনীত পাত্রীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন। গোপীমোহন প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিয়াও ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে নবীনচন্দ্রকে দরিদ্রাবস্থায় রাখিয়া স্বর্গা-

রোহণ করেন। এই সময় তিনি কলিকাতায় প্রাইভেট টিউসন করিয়া নিজ অধ্যয়নের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন এবং দয়ার সাগর প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। প্রথম ভাগ "অবকাশ-রঞ্জিনীর" পিতৃহীন যুবক ও শশাঙ্কদূত কবিতায় তাঁহার জীবনের এ অঙ্ক প্রতিভাত হইয়াছে। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিযোগী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নবীনচন্দ্র ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। তিনি বহুকাল বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যায় সুখ্যাতি সহকারে কার্য্য করিয়াছিলেন। তেজস্বিতা ও ন্যায়পরায়ণতার জন্য ডেপুটী জীবন তাঁহার পক্ষে পুষ্প-শয্যা হয় নাই, বরং সময়ে সময়ে বিপন্ন হইতে হইয়াছিল। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পর্য্যন্ত তিনি অবসর-বৃত্তি ভোগ করিয়াছিলেন। সরকারী কার্য্যে যে সময় তিনি নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় তিনি নিম্নলিখিত পুস্তক সকল লিখিয়াছিলেন:—

১। অবকাশ-রঞ্জিনী ১ম ভাগ। ২। অবকাশ-রঞ্জিনী ২য় ভাগ। ৩। পলাশীর যুদ্ধ। ৪। রঙ্গমতী। ৫। রৈবতক। ৬। কুরুক্ষেত্র। ৭। প্রভাস। ৮। অমিতাভ। ৯। ভানুমতী। ১০। গীতা। ১১। চণ্ডী। ১২। খ্রীষ্ট। ১৩। প্রবাসের পত্র।

তন্মধ্যে তাঁহার রচিত "পলাশীর যুদ্ধ" তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। যতদিন বঙ্গভাষা থাকিবে, যতদিন বাঙ্গালী বাঁচিবে, ততদিন লোকে তাঁহাকে মনোমন্দিরে পূজা করিবে। যাঁহারা বীণার বিনোদ ঝঙ্কারে এতদিন বঙ্গ-বাণীর কমল-কানন মুখরিত হইয়াছিল, যাঁহার ভক্তি, প্রীতি, প্রেম ও স্বদেশানুরাগপূর্ণ কাব্যকলাপের সুধাপ্রবাহ এত দিন বাঙ্গালীর চিন্তাপীড়িত ও দুঃখদলিত হৃদয়ে স্বর্গীয় আনন্দ রস ঢালিয়া দিয়াছে, তাঁহার মৃত্যুতে আজ সমগ্র বঙ্গবাসী দুঃখে ও শোকে ম্রিয়মাণ হইয়াছে। উদয়াস্ত প্রকৃতির নিয়ম। এই নিয়মের অধীন সকলেই। নবীনচন্দ্রও সেই নিয়মে বঙ্গীয় কাব্যগগনে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সমুদিত হইয়া কাব্য-জ্যোৎস্নায় বঙ্গীয় সাহিত্যগগন উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, সেই নিয়ম বশেই তিনি পুনরায় অস্তমিত হইলেন। যাও, অমর কবি, নবীনচন্দ্র, যাও অনন্তধামে, যেখানে মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্র প্রভৃতি কবিগণ গিয়াছেন, সেই সুখ ও শান্তিরাজ্যে অবস্থান কর! তোমার মহান্ কবিকীর্ত্তি তোমায় মর্ত্ত্যে অক্ষয় ও অমর করিয়া রাখিবে।

নবীনচন্দ্রের একমাত্র পুত্র মিঃ নির্ম্মলচন্দ্র সেন এক্ষণে রেঙ্গুণের চীপ কোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতেছেন। ভগবান তাঁহার এবং তাঁহার অন্যান্য পরিজনবর্গের শোকদগ্ধ-হৃদয়ে শান্তি প্রদান করুন।"

নবীনচন্দ্র।

হে কবি-বিহগ ওগো! কাব্য-কুঞ্জবনে,
হে নবীন! চিরদিন গাহিয়ে সঙ্গীত,
সহসা নীরব কেন বীণার ঝঙ্কার।
এখনোত নিশাশেষে হাসেনি তপন,
এখনোত উষারাণী গোলাপী-বসনা
পূরব-অর্গল খুলি দাঁড়ায়নি দ্বারে!
এখনোত জলধির ভৈরব গর্জ্জন
ছুটিছে ধাইছে অই প্রলয় তাণ্ডবে!
কোথা গেলে বাঙ্গালীর প্রিয় কবিবর,
কোথা গেলে? এস ফিরে, সহস্র কিরণ
সম দীপ্তময় দেব। শোন হাহাকার!
শোন অই ঘরে ঘরে করুণ-ক্রন্দন!
এস ফিরে—এস ফিরে হে কবি আমার
আবার জাগাও বঙ্গে ডমরু ঝঙ্কার!

২

একি স্বপ্ন! একি দীপ্ত। কিসের সঙ্গীত,
অই কি সে নন্দনের কবি-কুঞ্জবন?
অই হাসে হেমচন্দ্র বরমালা করে,
দাঁড়ায়ে রয়েছে ফুল্ল শ্রী মধুসূদন!
গাহিছে অপ্সরা কণ্ঠে মধুর সঙ্গীত!
এস প্রিয় হে নবীন কল্প-কুঞ্জবনে,
এই তব কাব্যভূমি, নেহার অদূরে,
তোমার উত্তরা সতী, 'ভদ্রা' মনোরমা
বীরশ্রেষ্ঠ 'অভি'তব—বীর মোহনলাল
স্মিত হাস্যে কলভাষে করিছে আহ্বান।
অই শোন ধ্বনিতেছে "নির্ব্বাণ! নির্ব্বাণ"
অই তব 'অমিতাভ' ধীর শাক্যসিংহ!
সকলেরি হাসিভরা বদন কমল,
তোমার সাধের বঙ্গে শুধু অশ্রুজল!

'সাধে কি বাঙ্গালী মোরা চির পরাধীন,
কে আর গাইবে কবি জীমূত মন্ত্রণে!
কে ডাকিবে কে কাঁদিবে সন্তাষি তপনে
ভাবি ঘোর অন্ধকার দীন ভারতের!
কার তুলি এঁকে দিবে অপূর্ব্ব সুন্দরী
সিরাজ-মহিষী-চিত্র সাধ্বী পতিব্রতা?
কে আঁকিবে বীর্য্যবতী রাণী মহীয়সী
রাণী ভবাণীর চিত্র অক্ষয় গৌরবে?
শ্যামল অঞ্চল-ছায় পল্লীর কুটীরে,
তরঙ্গিত নীল নভে অদ্রি মনোহর,
মনোহর তরু শ্রেণী জলধি গর্জ্জনে
কোন্ কবি আত্মহারা গাহিবে সঙ্গীত?
তব প্রিয় জন্মভূমি—চট্টল-জননী,
এতদিনে হারাইল পুত্র গুণমণি।

৪

তবে যাও হে মহান! মর্ত্ত্য-জন্মলীলা,
সমাপন এতদিনে—যাও পুণ্যলোকে,
ভুঞ্জ সেথা অনন্ত সে আনন্দ-সম্ভার!
তুমি নহ মৃত দেব তুমি যে অমর!
শুনি তাই তব নাম সপ্তকোটি মুখে।
ফুল যে ঝরিয়া যায় বিতরি সৌরভ,
তার স্মৃতি ভুলে যায় কোন্ সে পামর?
তোমার আশীষ বাণী—জাগিছে হৃদয়ে,
শুনিতেছি স্বর্গ হ'তে তোমার সঙ্গীত,
ফুরায়েছে বুঝি ওগো! ভীম অন্ধকার,
তাই কি হাসিছে পূর্ব্বে উষা মনোরমা।
কোটি জন্ম বেঁচে থাকি সঙ্গীত তোমার,
জাগাইবে নববলে বঙ্গবাসী জনে!
সে কিগো! সফল হবে এ কবি জীবনে?

৫

হে উজ্জ্বল! হে সুন্দর! কবিতা সুন্দরী,
অশোক তরুর মূলে কাঁদিছে মলিনা!
এলোকেশে দীনবেশে সে মুখচন্দ্রিমা,
হারায়েছে শোভা:তার, হায় মুখশশী,
শত মলিনতা মাখা! হে মৃত্যু! পামর,
একবার চেয়ে দেখ!—কাঁদিছে রূপসী,
ঝর ঝর ঝরিতেছে শুধু অশ্রুজল।
বীণা তার বাজেনাকো, থেমেছে মূর্চ্ছনা,
কলকণ্ঠ বিনীরব—কোথায় সঙ্গীত?
এস ফিরে—এস ফিরে—এস পুনরায়,
আবার তুলিয়া বীণা বাঁধ সপ্ত স্বর।
সে নাই সে নাই ধ্বনি পশিল শ্রবণে।
হেরিলাম চারিদিকে ঘন অন্ধকার!
গেছে চলে কবিশ্রেষ্ঠ দীন বাঙ্গালার।

৬

যদি গেলে, রেখে গেছ পীযূষ ভাণ্ডার,
সে যে সুধা অমরত্ব আমা সবাকার।
লহ দেব লহ পূজা, করহ গ্রহণ,
অজ্ঞাত ভক্তের এই করুণ তর্পণ।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

কবিবর নবীনচন্দ্র।

(দেহাবসান উপলক্ষে)

নাই নাই— সর্ব্ব ঠাঁই,
এ কি আজ ধ্বনিরে,
শোকে কার হাহাকার
করে বিশ্ববাণীরে!
কীর্ত্তি যাঁর বিশ্বজিত, স্মৃতি যাঁর অমলিন,
তুচ্ছ দেহ পরিহারে—নাই কিরে সে নবীন?
নাই নাই— সর্ব্ব ঠাঁই,
এযে মিথ্যা বাণীরে—
পৃথ্বী জুড়ে, মর্ম্মপুরে
তাঁরি সত্তা মানি রে!

২

নাই নাই সর্ব্ব ঠাঁই—
এযে ঘোর অনৃত—
কীর্ত্তিমান্ ত্যজে প্রাণ,—
মৃত্যু কি?—সে অমৃত!
স্মৃতি যাঁর বক্ষে চেপে ধরা গায় যশোগান,
ত্রিদিবের শুভ্রহস্ত গলে করে মাল্য দান,
নাই নাই— সর্ব্ব ঠাঁই
তাঁরে কি বলিস্ রে?—
এযে তাঁর পুরস্কার,
কর্ম্মের আশীষ রে।

৩

নাই নাই— সর্ব্ব ঠাঁই
কেন মিছে ছলনা—
গেহে গেহে, দেহে দেহে,
ব্যাপ্ত আছে, বলনা।
কায়ার বাঁধন খুলে মায়ায় বেঁধেছে ধরা—
সে-ই যে প্রকৃত বেঁচে, তাঁরে কি বলিস্ মড়া?
নাই নাই— সর্ব্ব ঠাঁই
ফের' তাঁরে খুঁজিয়া,
মর্ম্ম-পুরে বিশ্ব-জুড়ে
সত্তা তাঁরি গুজিয়া?

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস গুপ্ত।

কামরূপ। (২)

জড় ও চেতন পদার্থে ভেদ নাই। চেতনের ন্যায় অচেতন পদার্থ সাড়া দিতে পারে, ইহা সম্প্রতি প্রমাণিত হওয়ায় বহুকালের দ্বৈধ মিটিয়া গিয়াছে। মানবতত্ত্ব ও ভূতত্ত্ব, সেই কারণে একসূত্রে আবদ্ধ। ভূমির অবস্থা, জলবায়ু ও প্রাকৃতিক সংস্থান মনুষ্যের শারিরীক ও মানসিক ব্যাপারে কার্য করে।

বঙ্গদেশের ভূমি যেমন কোমল,পশ্চিমাঞ্চলের ভূমি তদ্রূপ নহে, ইহাতে বাঙ্গালী অপেক্ষা হিন্দুস্থানী দৃঢ়। বঙ্গের ন্যায় সুজলা, সুফলা ও শস্যশ্যামলা ভূমিতে দীর্ঘ কাল বাস নিবন্ধন আহোম জাতি নির্বীর্য্য হইয়া পড়িল। তাহাদের পূর্ব্ব বাসস্থলী হইতে অক্ষতবীর্য্য মান জাতি হিন্দুর উপরে, মুসলমানের আক্রমণের ন্যায়, বারম্বার ধাবিত হইতে থাকে। পৃথ্বীরাজের সহিত বিবাদ করিয়া জয়চন্দ্র যেমন সাহেবুদ্দিনকে আহ্বান করিয়াছিলেন, গুজরাটের মুসলমান রাজ যেমন মারাঠাদিগের সাহায্য গ্রহণ করিয়া শক্তি হারান, তদ্রূপ, ব্রিটিশবল ভিক্ষা করিয়া পরিশেষে আহোমরাজ আপনার রাজ্য ও আপন জাতির মর্য্যাদা লুপ্ত করিয়াছেন। অন্যের ক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া কেহ অধিক দিন তিষ্ঠিতে পারে না। কর্ম্ম না থাকিলে অকর্ম্মণ্য হইতে হয়। পরিশ্রম করিবার প্রয়োজন থাকা চাই, শ্রমবিমুখ অকর্ম্মণ্যেরা আপন ক্ষমতার অপব্যবহার করে, তদ্দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

আহোমরাজবংশ অকর্ম্মণ্য হইয়াছিল,সুতরাং অত্যাচারপরায়ণ না হইবে কেন? মোয়ামরিয়া সম্প্রদায় বৈষ্ণব মতাবলম্বী ছিল, বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে শাক্ত করিবার জন্য বলিদানে ছিন্ন পশুর রুধির দ্বারা উহাদের ললাটে তিলক অঙ্কিত করিয়া দেওয়া হইল। এবম্বিধ রাষ্ট্রনীতি-বিরুদ্ধ নানা কার্য্যে উৎপীড়িত হইয়া প্রজাকুল বিদ্রোহী হইয়া উঠে। তাহাতে "মানব উপদ্রব" বদ্ধমূল হইতে পারিয়াছিল।

উচ্চ ব্রহ্ম হইতে প্রভূত-সাহসী বৌদ্ধ শান জাতীয় যোধগণ আগমন করিয়া কামরূপে, যোগ্যতরের সংরক্ষণ নিয়মানুসারে, আধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন সত্য, পরে তাঁহারাই অযোগ্য হইয়া উঠিলেন। ইহাদের আহম নাম হইবার কারণ কি, জানি না। তাঁহাদের ইতিহাসকে বুরুঞ্জি কহে, উহা শান ভাষায় বিধিবদ্ধ। তৎকালের পুরোহিত বংশে অদ্যাপি বৌদ্ধত্ব বিদ্যমান। আমার পরিচিত গোঁহাই মহাশয়ের আকৃতি ব্রহ্মদেশীয়। তদীয়া কন্যা ক্ষীরোদা বাঙ্গালীর মত হইয়াছে। মধ্যযুগে আহমরাজগণের হিন্দু নামের সহিত একটী করিয়া শান আখ্যা মিলে। যথা সুহিতপাক্ফা বা গৌরিনাথ সিংহ, সুদ্দিনফা বা চন্দ্রকান্ত সিংহ ইত্যাদি। সুকাফা হইতে পুরন্দর সিং পর্য্যন্ত রাজ্যভোগ কালে ছয়শত বৎসর হইয়াছিল। বড়ুয়া, গোঁসাই, গোহাই,ফুকন উপাধি গুলি আহমরাজ প্রদত্ত। আমি শিবসাগর যাইতে পারি নাই। ইহা হইতেই সেই রাজকীর্ত্তির নিদর্শন লইয়া ক্ষান্ত হইলাম। তবে কাশীধামে

চন্দ্রকান্তের খুম্‌গাত কর্ত্তৃক ষষ্টি সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে নির্ম্মিত কামরূপের মঠ দেখিয়াছি। গোঁহাইয়ের পরামর্শ ভিন্ন রাজা রাষ্ট্রসম্বন্ধীয় কোন কার্য্য করিতে পারিতেন না। গোহাই-এর অধীন থাকিয়া বড়ুয়া সামাজিক ও সৈনিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ইহাতে রাজার একাধিপত্য প্রবলভাব ধারণ করিতে পারিত না। দণ্ডশক্তি রাজা পরিচালনা করিতেন। নাসাকর্ণছেদন প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল। দেশস্থিতি রীতিপ্রকরণে ইংরাজ অপরাধীর দণ্ড লঘু হইতে দর্শন করিয়া এখন আমরা ক্ষুব্ধ হই। ইংরাজের ব্যবহার শাস্ত্রে জাতিবিশেষের জন্য তারতম্য নাই। এখনকার আদর্শ সাম্য ভৃগু মনুস্মৃতি স্মরণ করিয়া বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ যদি শূদ্রকে বধ করে, বিড়াল কুকুরঘাতের ন্যায় প্রায়শ্চিত্ত করিবে। আহোমরাজ্যে ব্রাহ্মণের দণ্ড উক্ত নিয়মানুসারে অতি লঘু হইত। ন্যায় ও উদারতা না থাকিলে রাজ্যমাত্রেই শীঘ্র বা বিলম্বে ধ্বংস লাভ করে।

আহোম জনসংখ্যা ১৭৮০০০। পুরোহিতশ্রেণীর লোককে শীঘ্র স্থিতিশীলতা ত্যাগ করিতে দেখা যায় না। আহোমদিগের পূর্ব্ব গুরু দেওধাইগণ প্রেততুষ্টির জন্য পশুবলি ও ডিম্বস্ফোটন করিয়া ক্ষান্ত হন। আহোম-রাজ নবমতে দীক্ষিত হইয়া মনুষ্য ক্রয় করিয়া কামাখ্যা সন্নিধ্যে বলি দিয়াছেন; তাহার পোষ্যগণ বৃত্তি পাইত। আহোমজাতির বিবাহ অদ্যাপি পূর্ব্বতন নিয়মে আবদ্ধ।

আহোম ইতিহাস আলোচনা করিয়া অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ সম্বন্ধে দৃষ্ট হইল, কর্ম্মক্ষেত্রে "সর্ব্বঃকার্য্যবশাৎ জনোভিন্নমতে কস্যাস্তি কোবল্লভঃ।" যে জাতিকে এক সমাজ এক সময়ে ক্ষত্রিয়ের সম্মান দিয়াছিল, অধুনা তাহাদের ক্ষমতালোপে স্পৃষ্টজল পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে অসম্মত। ব্রিটিশরাজ যাহার শত্রুদমন করিতে আসিয়াছিলেন, তাহার বংশধর সিংহাসনচ্যুত। যাঁহাকে এখন একমাত্র উত্তরাধিকারী বলা হয়, তিনি অনুগ্রহের ভৃতি মাসিক ৫০ পঞ্চাশ টাকা ত্যাগ করিয়া সিলেটে ১৫০ দেড়শত টাকার বেতন গ্রহণ করিয়া সাধারণ কর্ম্মচারী হইয়াছেন। "যথাস্থানঃ ক্রিয়াঃ প্রাণাঃ সর্ব্বেষাম্ প্রাণিনাম তথা"। ইহা ধর্ম্মক্ষেত্রের কথা, কর্ম্ম ও ধর্ম্মে সামঞ্জস্য বিধানে মনুষ্যত্ব। তাহাই শ্রেয়ঃ।

আহোমদের গ্রাম্যদেবতার সহিত বঙ্গের গ্রাম্যদেবতার ঐক্য আছে। গোয়ালপাড়ায় বিষহরি বা মনসা, হুবাচনি বা সুবচনি পূজিতা। গারো ও মেচ জাতি সিজু বা মনসাবৃক্ষের পূজা করে। নাগপূজা ভারতের সর্ব্বত্র বিদ্যমান। মনসাবৃক্ষের পূজা বাঙ্গালী ভিন্ন কেবল গারোদের মধ্যে দেখিয়া উভয়ে যে কোন সংশ্রব আছে, তাহা অনুমেয়। আমাদের ক্রিয়াকলাপ, বৈবাহিক বেশ ও স্ত্রী আচার প্রভৃতির মধ্যে ইতিহাস প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে।*

সত্যশ্রবা কহিয়াছেন, কোচ্ জাতির জলস্পর্শ করিলে অপবিত্র হইতে হয়, রিজ্‌লি কহেন, ব্রাহ্মণে তাহাদের স্পৃষ্ট জল গ্রহণ করেন; ইহাতে বিদেশী লেখকের উক্তির প্রতি অনাস্থা জন্মিবার সম্ভাবনা। আমি এতদ্দেশে আসিয়া বিদেশীর অনুসন্ধান কার্য্যের সত্যতা

* উত্তরায়ণ সংক্রান্তি (পৌষপার্ব্বণ) দিনে করণীয় "বিহু"তে কামরূপে বাঙ্গালার মত পিঠা প্রস্তুত হইয়া থাকে। হিন্দুস্থানীদের তদ্বৎ পিষ্টক প্রস্তুত করিবার নিয়ম নাই। আহোমিয়া জাতির সংস্পর্শে আমরা বা আমাদের সংস্পর্শে তাহারা এই পর্ব্বাহ প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে।

প্রত্যক্ষ করিলাম। কাশী ও নবদ্বীপে কোচের দান-গ্রহণ নিষিদ্ধ নহে। আসামের যতগুলি জাতি আছে, তন্মধ্যে জনসংখ্যায় ইহাদের ভাগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, ২২১০০০ গণিত হইয়াছে। যোগিনীতন্ত্রে প্রকারান্তরে ইহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলা হইয়াছে। বাঙ্গালায় এই জাতীয় রাজা ও ত্রিপুরাধিপ স্বাধীন নৃপতিরূপে আমাদের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন, কোচরাজ বংশের সহিত এখানকার বেলতলারাজ সংশ্লিষ্ট, কোচবংশ কামরূপে দুইশত বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন। আহোমদিগের সহিত তাহাদিগকে সংগ্রামে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। কাছাড়ী, লালুঙ, মিকির ও অন্যান্য জাতি হিন্দু হইবার পূর্ব্বে কোচ্ হইয়া পড়ে; অন্যদিকে উত্তর বঙ্গে সামাজিক সম্মানে কোচ্ জাতি হীনতা লাভ করায় রাজবংশী নাম গ্রহণ করিয়াছে। কোচ্দিগের পূর্ব্ব ভাষা লুপ্ত হইয়াছে, যাহা অবশিষ্ট দৃষ্ট হয়, তাহা গারো ভাষার তুল্য। পূর্ব্বে কোচ্ ও মেচ্ জাতিতে বিবাহ হইত, প্রথম জাতি হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করায় তাহা রহিত হইয়াছে। পরিবর্ত্তন কেহ নিবারণ করিতে পারে না। অক্ষর রূপান্তর করিতে কোন ব্যক্তি প্রয়াসী হন না, অথচ পূর্ব্বের অক্ষর হইতে এখনকার বর্ণমালা কেমন বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। সুবিধার সহিত ঘনিষ্টতা মিশ্রিত হইলে পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য। এই রূপে আর্য্যীকরণে গৃহীত অসংখ্য মানব অনার্য্য ভূভাগকে আর্য্যভূমিতে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে। কুচবেহারাধিপতিকে এক্ষণে আমাদের বঙ্গাধিপ বলিয়া সম্মান করা কর্ত্তব্য।

উত্তরবঙ্গে কাছাড়িজাতি মেচ্নামে প্রসিদ্ধ। কামরূপে মেচ্বংশীয় রাজগণ গৌরবাস্পদ আর্য্যধর্ম্ম-গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। পূর্ব্ব কাহিনীতে সুখসম্পদ ও ঔজ্জ্বল্যের চিহ্ন না থাকিলে তাহার সংশ্রব রাখিতে কেহ যত্নবান হয় না। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন করিতে গিয়া মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনকে আদিপুরুষ নির্ণয় করিয়াছেন। নওগাঁ প্রদেশের বর্ত্তমান ডীমাপুর কাছাড়ের প্রাচীন রাজধানী হিড়িম্বপুর বলিয়া অনুমিত হয়। এই রাজবংশীয় জাতি আসামে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন অধিবাসী, তাহাদের অপর নাম বোদো। নরকাসুর, বোধ হয়, এই জাতির লোক ছিলেন। শেষপর্য্যায়ে তিনশত বৎসর আসামে ইহাদের রাজ্য হইয়াছে। বসুন্ধরা কাহারই নহে, তথাপি ইহাদের তৎকালের প্রতিদ্বন্দ্বী আহোমরাজসহ বৈরিতা করিতে হইয়াছিল।

শ্রীহট্টের দিকে অবতরণ করিলে আমরা তাম্রনির্ম্মিতা জয়ন্তেশ্বরী কালিকা দর্শন করিয়া যাইতে পারিতাম, ইহা কামাখ্যার ন্যায় সতীর একপঞ্চাশত পীঠের অন্যতর স্থান। খস ও জয়ন্তী জাতির ভাষা ও আকৃতিতে প্রভেদ নাই। খাসিগণ পর্ব্বতের উপর, কিন্তু জয়ন্তীয়ারা সমভূমিতে বাস করে। তাহাদের গ্রাম্যশাসনে খসজাতিবৎ প্রতিনিধি প্রণালী বর্ত্তমান।* জয়ন্তীরাজ ব্রাহ্মণ্যমত গ্রহণ করিয়া ঘোর শাক্ত হইয়াছিলেন। পর্ব্বতরায় (১৫০০—১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ) হইতে রাজেন্দ্র সিংহ পর্য্যন্ত ৩৩৫ বৎসর আসাম তাঁহাদের করতলস্থ ছিল।

একজন কহিয়াছেন, আমি দেশের স্থানের বিবরণের অপেক্ষা তাহার অধিবাসীর প্রতি অধিক মনোনিবেশ করিয়া থাকি। এক্ষণে আমার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ক্রমে ঐতিহাসিক বৃত্তান্তে পরিণত করিতেছি। যাহা হউক, জাতিতত্ব কেবল আকৃতি দ্বারা নির্ণীত নহে, পুরাবৃত্ত

* পূর্ব্ব ধর্ম্ম বোধ হয় ত্যাগ করে নাই।

দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। ইহার যৎকিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করা অধিবাসীর পরিচয়কল্পে প্রয়োজনীয়।

কালিকাপুরাণোক্ত নরবলির অনুষ্ঠান দ্বারা জয়ন্তেশ্বরীকে প্রসন্ন করিবার অধুনা কোন উপায় নাই। জয়ন্তীরাজের আধিপত্য কালে নবরাত্রির সময়, রাজপুত্রের জন্মোৎসবে, বা কোন ইষ্টসিদ্ধি ঘটিলে নরঘাত অবশ্যম্ভাবী ছিল। পারলৌকিক শুভকামনায় স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া প্রায়শঃ হতব্যক্তি বলিরূপে আত্মোৎসর্গ করিতেন। এই মহাত্যাগী পুরুষের সদসৎ সর্ব্বপ্রকার বাঞ্ছাপূর্ণ করিতে কেহ আপত্তি করিত না। স্বভাবসিদ্ধ প্রাণভয়ে সম্মত ব্যক্তি পলায়নপর হইলে রাজা অপরের অধিকৃত স্থান হইতে কাহাকেও ধৃত করিয়া কার্য্য সমাধা করিতেন। ইংলণ্ডীয় সম্রাজ্যের সহিত জয়ন্তীরাজের সম্বন্ধকালে ঐ প্রকার অপরাধ হইয়াছিল, এই হেতুবাদে জয়ন্তাভূমি বৃটিশরাজ্যভুক্ত হইয়াছে।

ইংরাজ শাসনকর্ত্তাগণ নরবলির আত্মতত্ত্বানুযায়ী ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হন নাই; ইহাতে কামরূপে জনপদগণের জীবন নিরাপদ করিয়াছেন। আত্মদোষ উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা লোকের অতি অল্পই থাকে। রাজতন্ত্রে ত্রুটি ঘটিলে উদ্দাম নৃপতির পক্ষে সংশোধন করা অসম্ভব; তখন বিপ্লব ভিন্ন সাম্য স্থাপনের গত্যন্তর নাই। বলপূর্ব্বক নরবলী দেওয়া অতি গর্হিত; রাজা ইহাতে লিপ্ত হইলে তাঁহার পতন নিতান্ত বাঞ্ছনীয়, সে স্থলে স্বদেশীরাজ্য অপেক্ষা বিদেশীরাজ্য কেনা প্রার্থনীয় জ্ঞান করিবে?

ভারতে বৈষম্য-স্রোত নানাভাবে প্রবল হইয়াছিল। রাজন্যগণ স্বেচ্ছাচারী, দণ্ডশক্তি, ও ন্যায়মার্গচ্যুত পারমার্থিকতার প্রাবল্যে, বহুকাল যাবৎ শান্তি সম্ভোগ প্রভৃতি কারণে অকর্ম্মণ্যতা আসিয়া আমাদিগকে পরাধীন করিয়াছে। অমারা যাঁহাদের অধীন, তাঁহারা বিদেশী, সুতরাং উভয়ের স্বার্থ বিভিন্ন, ইহাতে ইংরাজশাসনে ত্রুটি থাকা সম্ভব। ভারতবাসী ইংরাজকে স্বরাষ্ট্র প্রদান করিয়া নানা প্রকারে উপকৃত হইয়াছে, ভারতের দ্বারা তদ্রূপ ইংরাজেরা উপকৃত হইয়াছে; পরস্পরের সাহায্যে মানবজাতি ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে। ইংরাজ বৈশ্য জাতি, তাঁহারা যে ধনশোষণ করিতে পটু হইবেন, ইহা বিচিত্র নহে, কিন্তু আমাদের রাজা বৈশ্যজাতি না হইলে, দেশের ধন ক্ষত্রিয়ের বুদ্ধিতে এবম্প্রকার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত না। ইংরাজশাসনের গুণ ও দোষ বর্ণনকালে গুণ এক পৃষ্ঠা ও দোষ চারিশত পৃষ্ঠা লিখিয়া আমরা দেশানুরাগের পরিচয় দিতেছি, ইহাতে অনেকের ভ্রান্তধারণা হইতেছে। বস্তুতঃ দেশের সুখসমৃদ্ধি অনুকূল অবস্থার সাহায্যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। যে পরিমাণে সময়ের গুণে বর্দ্ধমান হওয়া সম্ভাবিত, তাহার ত্রুটি ঘটায় সকলে প্রমাদ গণিতেছেন। এরূপ হওয়া উচিত, নহিলে জাতীয় জীবনীশক্তি হ্রাস হইতে পারে। কৃতজ্ঞতা মনস্বিতার পরিচায়ক। আমাদের তজ্জন্য ইংরাজ শাসনের গুণের প্রতি শ্রদ্ধা করা বিধেয়। দেশী বা বিদেশী হউক, প্রতিনিধি প্রণালীর শাসন সংস্থাপিত না হইলে প্রজার কল্যাণ নাই। অনন্যসাধারণ বৈষম্যের লীলাভূমি ভারতবর্ষে বৃটিশ সহায়তা ব্যতীত তাহা সাধিত হওয়া অসাধ্য। নবতন্ত্রের কথায় প্রজাশক্তিকে দেশের নিয়ন্তা করিবার কল্পনা হইয়া থাকে। একচ্ছত্র রাজশক্তিকে

অভাবে, ভারতের ন্যায় বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন স্বার্থ, সমবেদনাহীন প্রজাশক্তি কার্য্যকরী হইবে না। রাজশক্তি ও প্রজাশক্তের সামঞ্জস্য থাকিলে আমাদের উন্নতির অন্তরায় দূর হইবে; ইহাই এদেশের উপযোগী। রাজশক্তি এখন সাম্রাজ্যবাদের কুহকে প্রজাশক্তিকে বিনষ্ট করিতে সঙ্কল্প করিয়াছে; অতএব আমাদের আত্মনির্ভরশীলতার উদ্রেক করিতে হইবেক।

সে কালের আসাম ও একালের আসামে তুলনা করিলে আধুনিক সময়ে সকল বিষয়ে উন্নতি দৃষ্ট হইবে। জগৎ ক্রমে সভ্যতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। বিভিন্ন জাতির পরস্পর-সাহায্য সমৃদ্ধির মূল। বণিকরাজ ইংরাজ কামরূপে তাহার নিমিত্ত মাত্র। আসামীরা পূর্ব্বে নাগাদের মত ছিল, বাঙ্গালীর সংস্রবে সভ্যতা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে।

কামাখ্যায় স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত বলি হইতে প্রস্তুত জনগণের কোন প্রকার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা অবৈধ ছিল না, ভোগীগণ লাম্পট্যকে আদরের বিষয় করিত। তান্ত্রিক পণ্ডিত প্রকৃতির উৎপাদন-ক্রিয়াকে স্ত্রী আকারে শক্তি ও ক্ষমতাশূন্য, স্রষ্টা বা পুরুষকে পুং আকারে একত্রিত করিয়া তাহার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করতঃ অদ্বৈতভাব প্রদর্শন ও আত্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা আনিয়া বন্যভাবের সহিত সভ্যভাবের সমন্বয় করিয়া থাকেন।

আমরা আপনার অস্তিত্বে না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারি না। সুতরাং আমরা যাহার অধিক বুঝি না, তাহা সত্য, এইজন্য দার্শনিক ধার্ম্মিক প্রভৃতি বহু আয়াসে আপন মত প্রচার করিতে ব্যস্ত। যদি কোন স্থানে অসঙ্গতি পরিদৃষ্ট হয়, তন্নিবারণ-কল্পে বিধি-মতে যত্ন হইয়া থাকে। শাক্ত বৈষ্ণবের যেস্থলে পশুভাব আছে, তাহাকে দেবত্ব প্রদানের জন্য সাংখ্যবেদান্ত আশ্রয়-স্থল হইবে, ইহার মূলে মনুষ্যের আত্মাদর প্রবৃত্তি-কার্য্য করিতেছে। আত্মতত্ত্ব অতি জটিল।

স্বকীয় মনোভাব অনেক সময় পরিষ্কার করিয়া বুঝা কঠিন। জনসাধারণের মনের গতি স্থির করা তদপেক্ষা দুরূহ। চিত্তের দ্বারা চিত্ত পরীক্ষায় বিশুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা কোথায়? মনুষ্য এখন তিন বৎসর বয়সে আরম্ভ করিয়া ১৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালে আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হয়। ইহা উপার্জ্জন করিতে মানবজাতিকে বহু সহস্র বর্ষ তপস্যা করিতে হইয়াছিল। আমরা উত্তরাধিকারিতার ফলে অল্পদিনে তাহা লাভ করিতেছি। মনুষ্যের যতপ্রকার জ্ঞান আছে, তাহার সকল গুলি লইয়া আত্মজ্ঞান। বর্ণজ্ঞান সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা কহেন, ৩০ সহস্র বৎসরের ন্যূনকল্পে মানব জাতি ইহা অর্জ্জন করিতে পারে নাই। জাতিস্মর শিশু পঞ্চ বা ষষ্ঠ বৎসরে এখন তদ্‌গুণশালী হইতেছে। বর্ণজ্ঞানের পরে গন্ধজ্ঞানের উৎপত্তি; শৈশবের কোন্ সময় মনুষ্য তাহা লাভ করে, অদ্যাপি তাহা নির্ণীত হয় নাই। সঙ্গীতজ্ঞান পঞ্চ সহস্র বৎসরের অনুশীলনের ফল। পূর্ব্বপুরুষের পুণ্যে যুবক যুবক ১৫ হইতে ২০ বৎসর বয়সের মধ্যে তাহাতে সিদ্ধি লাভ করে। নীতিজ্ঞান অর্জ্জন করিতে নৃসমাজকে অযুত সম্বৎসর পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে বা ঊর্দ্ধতন পুরুষের অনুশীলন প্রভাবে এখন আমরা পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে সেই ধন লাভ করি। এবম্বিধভাবে সুদীর্ঘকালে লব্ধ বিভিন্ন বোধের আধার আপন অস্তিত্বকে নিতান্ত অভ্রান্ত জ্ঞান করা অসঙ্গত।

কামরূপে নারীজাতির পাতিব্রত্য সম্বন্ধে

শিথিলতা ও তান্ত্রিক অভিচার-ক্রিয়ার প্রাদুর্ভাব বশতঃ পূর্ব্বকালে বঙ্গে নানা গ্লানিসূচক জনশ্রুতি প্রচলিত হইয়াছিল। বাঙ্গালা ব্যতীত ভারতের সর্ব্বত্র দ্বিজাতি ভিন্ন বিধবার বিবাহ প্রচলিত আছে। অধিকন্তু আসামে বৈধ বিবাহের প্রচলন স্বল্প; তজ্জন্য দাম্পত্য-বন্ধন ছেদন করা দুরূহ হয় না। অনার্য্যগণ আর্য্যীকরণে গৃহীত হইয়া বিবাহ সম্বন্ধে পূর্ব্বতন আচার সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। "আগচালুয়া" বিবাহে সমাগত জনকে পান সুপারি দেয়, ইহা অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে সম্পন্ন হইতে পারে। "গুড পিঠা-খোয়া-বিবাহ" বর-কন্যার সম্মতি সাপেক্ষ, বর কন্যাকে "ঋহা ও মেখলা" নামক বস্ত্র মাদুলি প্রভৃতি অলঙ্কারসহ প্রদান করিলে সম্বন্ধ স্থির হয়। কন্যাকর্ত্তা গ্রামিকদিগকে আহ্বান করিয়া চিপিটক ও গুড প্রদান করে। স্বর্ণকার, কুম্ভকার, নাপিত, কর্ম্মকার, নট, কাটানি প্রভৃতি জাতির মধ্যে উক্ত প্রকারের বিবাহ প্রণালী প্রচলিত। ঐ সকল জাতির সাধারণ নাম ছোটকলিতা। শাস্ত্রীয় ভাষায় ছোটকলিতার বিবাহকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলিতে হইবে।

ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, গণক ও বড়কলিতা "হোম জ্বালানি" বা প্রাজাপত্য প্রণালীতে বিবাহ করেন। সে বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয় না। ছোট কলিতারা এই প্রণালীতে বিবাহ করা এখন শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিতেছেন। ব্রাহ্মণ, কায়স্থেরা অবশ্য বিদেশী। বড়কলিতা ও কায়স্থে অসবর্ণ বিবাহ হইয়া থাকে। কায়স্থের সংখ্যার ন্যূনতা ইহার কারণ। কলিতা বড় ও ছোটতে প্রভেদ কি, আমরা বুঝিতে পারি না। জীবেশ্বর, মৌজাদার কহিয়াছেন, ভারবহন, হলচালন ত্যাগ করিলে ছোট লোক বড় হয়; ছোট বড় বিশেষণ দ্বারা উভয়ের একজাতিত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। বাঙ্গালীকে কলিতা অর্থে কায়স্থ বুঝাইবার চেষ্টা করিতে দেখিয়াছি; তাহার ইতিহাস পর্য্যন্ত আছে। পরশুরামের ভয়ে যে সকল ক্ষত্রিয় অজ্ঞাতবাস করিতেছিলেন, তাঁহারা "কুললুপ্তা" বা কলিতা নামে প্রসিদ্ধ। গান্ধর্ব্ব বিবাহ ছেদন জন্য ধর্ম্মাধিকরণে অভিযোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। ত্রিপুরা ও কুচবিহার রাজপরিবারে বিবাহ প্রণালীর বৈধতাকে সূত্র করিয়া ব্রিটিশরাজ উত্তরাধিকারী নির্ণয় করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, গান্ধর্ব্ব বিবাহের জটিলতা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য আসামীরা প্রাজাপাত্য বিবাহের আশ্রয় লইতেছে। গান্ধর্ব্ব বিবাহে কন্যা বয়স্থা হইলেও প্রাজাপত্য বিবাহে কন্যার অল্প বয়সে বিবাহ সংস্কার অবশ্যম্ভাবী। গান্ধর্ব্বের বৈদিক মন্ত্রের পরিবর্ত্তে মাতৃভাষায় দম্পতিকে উপদেশ প্রদত্ত হয়। আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ যৌতুক প্রদান করিলে কন্যাকর্ত্তা তাঁহাদিগকে বস্ত্রাদি প্রদান করিয়া সম্মানিত করেন।

ব্রাহ্মণকুমার হস্ত্যশ্ব বা শিবিকা আরোহণ করিয়া বিবাহ করিতে যান, ঢোল করতাল বাজিতে থাকে, পুরস্ত্রিগণ মঙ্গলগীত করিয়া সমভিব্যাহারে যাত্রা করেন, বরযাত্রিক কেহ কেহ হস্তিতে আরোহণ করিয়া থাকেন। দিবাভাগে বিবাহ হইবার আপত্তি নাই। স্বর্ণসূত্রখচিত শ্লথ উপানতধারী বর ধুতি চাদর পরিয়া, অলঙ্কার দ্বারা সজ্জিত হইয়া বনাত বা শাল সহযোগে গাত্রাভরণ করত মস্তকে উষ্ণীষ প্রদান করেন। ব্রাহ্মণ আপন বিশুদ্ধতা রক্ষার মানসে নিকট সম্পর্কীয় ব্যক্তি ভিন্ন ভোজ্যান্নতা রক্ষা করিতে

অক্ষম, তদ্ধেতুক চিপিটকের অনুরূপ জল-সিক্ত "বোকা" তণ্ডুল দধি কদলী সহ ভোজন করিয়া কুটুম্বকে প্রীত করিয়া আসেন।

একদা খাসি পল্লীতে পরিভ্রমণ করিতে যাইয়া শিলাহট্টবাসী জনৈক বাঙ্গালীর সহিত পরিচিত হইলাম। তিনি এক খস রমণীকে ব্রাহ্মমতাবলম্বিনী করিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহার গর্ভজাত সন্ততি খস আবরণ বস্ত্র ধারণ করিয়া বিচরণ করিতেছে, দৃষ্ট হইল। বর্ত্তমান সময়ে বাবুটী খ্রীষ্টান হইলেও, শর্ম্মা উপাধি পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। অধিকন্তু রাজপ্রতিনিধির সমধর্ম্মী হইয়াছেন বলিয়া সুখী হইতেছেন। রাঙ্গ পল্লীর শিখর ভাগে উত্থিত হইয়া অন্যদিন দেখিয়াছি, খ্রীষ্টীয় ভজনালয়ে আচার্য্য উপাসকের অভাবে একাকী স্বীয় কর্ত্তব্য বোধে যথাসময়ে সুসমাচার প্রচার করিতেছেন। সেই পার্ব্বত্য স্থানের নিম্নে স্রোতসিনী-বক্ষে সেতুপরি দণ্ডায়মান হইয়া হরিসভায় যোগ দিবার জন্য জনসমাগম দর্শনে আমার মনে হইল, আত্মাদরের কি মোহিনী শক্তি, ইহার প্রভাবে খ্রীষ্টান হিন্দুকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে চায়।

শিলঙ শৈলের পথ সিমলা ও দারজিলিঙ্গের ন্যায় প্রৌঢ় লোকের পক্ষে ক্লেশদায়ক নহে। যদৃচ্ছা ক্রমে কদাচিৎ রক্তিম পথে বিচরণ করিতে গিয়া পথি পার্শ্বে ঘনসন্নিবিষ্ট সরলদ্রুমের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলাম। সুরঞ্জিত অয়স-পত্র-নির্ম্মিত বহুচূড়া সমন্বিত ইউরোপীয় সুবৃহৎ হর্ম্ম্য নয়নপথগামী হইল। অহোঃ, আমি রাজপ্রাসাদের অঙ্গনে প্রবেশ করিয়াছি! ইতস্ততঃ না করিয়া একবারে চলিয়া যাইতে পারিলে কেহ বাধা দিতে সাহস করে না, সেই জন্য গুরখা প্রহরী আমাকে কিছু বলে নাই, সে সদর্পে স্কন্ধে যন্ত্র রক্ষা করিয়া স্বীয় পাদচারণায় মনোনিবেশ করিয়াছিল। আমি আর অগ্রসর না হইয়া হ্রদের দিকে অবতরণ করিতে লাগিলাম। মহামতি কটন এই স্থানকে উপবনে পরিণত করিয়া গিয়াছেন, ইহাই এখানকার বিশেষ দর্শনীয় স্থান। হ্রতলে বাপীর উপর সেতু দর্শন করিয়া তদুপরি যাইতে ইচ্ছা হইল। তথা হইতে বারিপাত উচ্ছ্বাসিত অববোধ দৃষ্ট হইলে তদুদ্দেশে ধাবিত হইলাম। পার্শ্ববর্ত্তী পথগুলিতে পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া তৃপ্ত হইতে বাসনা হইল। যাহাতে আকৃষ্ট করে, তাহার সকলই মনোরম বোধ হয়। উপরে দেখিতেছি, কর্ত্তিত তৃণাচ্ছন্ন মসৃণ হরিৎবর্ণের ক্রমাবনত ভূমি, অধোদেশে হরিতের মধ্যে রক্তিমা বিস্তার করিয়া কুসুমিকার পার্শ্বে রেখার মত শীর্ণবর্ত্ম জনহীন হইয়া মধুরতার নিকেতন হইয়াছে। এবার অন্য পথ আবিষ্কার করিয়া স্বকীয় কুটীরে উপনীত হওয়া গেল।

শ্লেষ্মার আতিশয্য দেখিয়া সত্বর শৈল পরিত্যাগ করিলাম। বাষ্পীয় তরণী হইতে গোয়ালপাড়ার পর্ব্বতের সৌন্দর্য্য দেখিয়াছি, স্মরণ আছে। জগন্নাথগঞ্জে পাটের ক্ষেত্র-মধ্যস্থ ভোজন গৃহে আহার করিয়া বুঝিলাম, ম্যালেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছি। তদনন্তর নারায়ণগঞ্জ হইতে কখন গোয়ালন্দে উত্তীর্ণ হইলাম, তাহা স্মৃতিপথারূঢ় হয় না। আসাম অস্বাস্থ্যকর জ্ঞানে ভ্রমণ বিলম্বিত করিয়া আশঙ্কিত ফল দ্রুত লাভ করিয়াছি।

শ্রীদুর্গাচরণ ভূতি।

গিরিজাপ্রসন্ন। (১)

তরবোঽপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ।
স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি॥

যোগবাশিষ্ট।

গিরিজাপ্রসন্নের জীবন চরিতের আবশ্যকতা।

বঙ্গসাহিত্য-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট গিরিজা-প্রসন্ন অপরিচিত নহেন। যতকাল সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি বিলুপ্ত না হইবে, আমরা একান্ত সাহস সহকারে বলিতে পারি, গিরিজাপ্রসন্নের স্মৃতিও তত কাল সকলের হৃদয়ে জাগরূক রহিবে।

আজকাল বঙ্গভাষা যৌবনের স্তরে পদার্পণ করিয়াছে। ভারতহিতৈষী বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত ইহার স্রষ্টা। বঙ্কিমচন্দ্র এই ভাষার পূর্ণাঙ্গদাতা। অধিক দিনের কথা নহে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবিতাবস্থায়ই এই মাতৃভাষার যেরূপ দৈন্য দৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতে এই ভাষা যে এত অল্প দিনে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী হইয়া ভারতের অন্যান্য লোকেরও সেবার যোগ্য হইবে, এরূপ আশা অনেকেই হৃদয়ে স্থান দিতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র এই মাতৃভাষার সেবায় জীবন মন সমর্পিত করিয়া বঙ্গ-সাহিত্য ক্ষেত্রে কেন—পৃথিবীর সমগ্র সাহিত্য-ক্ষেত্রে অসাধারণ কীর্ত্তি ও অক্ষয় সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। বঙ্গবাসী এই মহৎ উপকারের জন্য তাঁহার নিকট চির ঋণী। জাতীয় উন্নতি, ধর্ম্মোন্নতি, সমাজ সংস্কার ইত্যাদি সমস্তই এই মাতৃভাষার উন্নতি-সাপেক্ষ।

আর যিনি বঙ্কিম বাবুর অমৃতময়ী লেখনী-প্রসূত অতুল্য সৃষ্টি-প্রকরণের ব্যাখ্যা করিয়া আশৈশব সকলকেই বুঝাইবার জন্য "বঙ্কিম-চন্দ্র" রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সাধু উদ্দেশ্যের জন্য,—গুণগ্রাহীতার জন্য—একটী জাতীয় জীবনকে পরিণতির পথ প্রদর্শনের জন্য, আমরা কি তাঁহার নিকট কম কৃতজ্ঞ?

আজ ঘরে ঘরে সুধিগণ বঙ্কিমবাবুর পুস্তক পাঠ করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন, সকলেই বঙ্কিম বাবুর অসাধারণত্ব এক মুখে স্বীকার করিয়া জন্মভূমির গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন। বঙ্কিম বাবু যে আমাদের নিকট এত পূজ্যের, এত আরাধনার, এত অনুকরণের যোগ্য, পূর্ব্বে কয় জন তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন?

বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য-ক্ষেত্রে পদার্পণ করার সময় যাঁহারা তাঁহার অসাধারণত্ব ও বিশেষত্ব বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা অধিক নহে। আমাদের দেশীয় উজ্জ্বল রত্নগণ তৎকালে বিদেশীয় রাজার সঙ্গে অধিক সম্বন্ধ রাখিতে গিয়া সংসর্গ দোষে অনুসরণীয় পথ-ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাই বলিয়া আমরা একথা বলিব না যে, সেই সময়ে গিরিজা-প্রসন্নের ন্যায় কেহ সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। যাঁহারা পারিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহার গ্রন্থপাঠ সুখে মত্ত হইয়া নিজের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। মনস্বী গিরিজাপ্রসন্ন কেবল নিজের সুখের পথ উদ্ঘাটিত করিয়া পরিতৃপ্ত রহেন নাই। তিনি বঙ্কিম-লেখনী-প্রসূত সঞ্জীবনী শক্তি অপরের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়া দেওয়ার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই মহৎ চেষ্টার ফল—তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

গ্রন্থ, বঙ্গ সাহিত্যে বড়ই আদরের ধন—"বঙ্কিমচন্দ্র"।

আজকাল বালকের মুখেও বঙ্কিম বাবুর ভূয়সী প্রশংসা শুনিতে পাই। বালকদের কথা কেন, আমরাও কি গিরিজাপ্রসন্নের "বঙ্কিমচন্দ্র" পাঠ না করিয়া বঙ্কিম বাবুর অপূর্ব্ব সৃষ্টি-কৌশল—শিল্পের রমণীয় চাতুর্য্য—সুখের উপকরণ—চিন্তায় মনোমোহন—প্রতাপ গোবিন্দলাল, শ্রী জয়ন্তী, সীতারাম চন্দ্রশেখর, প্রফুল্ল শান্তি প্রভৃতি নরনারীর চরিত্র-মাধুর্য্য বিন্দুমাত্রও অনুধাবন করিতে পারিতাম? অনেক পণ্ডিতের মুখেও শুনিয়াছি, বঙ্কিম বাবুর পুস্তক পাঠ করিয়া যদি সার ভাগ গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে নাকি বেদ বেদান্ত পাঠের ফল লাভ হয়। যদি বঙ্কিম বাবুকে এত উচ্চ আসন দিলে সত্যের রেখা উল্লঙ্ঘিত না হয়, তাহা হইলে একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে গিরিজাপ্রসন্নের "বঙ্কিম চন্দ্র" সেই বেদ বেদান্ত প্রচারেরই সাহায্য করিতেছে, গিরিজাপ্রসন্নের "বঙ্কিমচন্দ্র" একখানি উৎকৃষ্ট উপদেশপূর্ণ ধর্ম্ম গ্রন্থ। হিন্দু উপাস্য মাত্রেরই উপাসনা পথের পরিচালক। ইউরোপীয় বিখ্যাত পণ্ডিত মেকলে বলিয়াছেন "পুস্তকের মধ্য হইতেই গ্রন্থকারকে চিনিয়া লওয়া যায়।" আমরাও বলি, একথা যথার্থ। কিন্তু যে স্থলে লেখক শিক্ষকের আসনে সমাসীন হইবার জন্য উপযুক্ত গুণলব্ধ না হইয়া শিক্ষা প্রদান করেন, সেস্থলে গ্রন্থকারকে পুস্তকের মধ্য হইতে বাছিয়া লওয়া যায় না। যিনি লেখক, তাঁহার উপদেশ খাটি হওয়া চাই, কতক বা তাহার জীবনে প্রতিফলিত করিয়া বাক্য ও জীবনের ঘটনার সঙ্গে ঐক্য রাখা চাই। উপদেষ্টার চরিত্র যদি অনুকরণীয় না হয়, তাহা হইলে, তাহাতে যেমন সজীব শক্তি নিহিত থাকে না, তেমন, লোকের হৃদয়ও আকর্ষিত হয় না। এই হিসাবে, অনেক দেশের লেখকই ঘৃণ্য। এই শ্রেণীস্থ লেখকের উদ্দেশ্য কেবল যশঃ অর্জ্জনেই কেন্দ্রীভূত।

সাহিত্য-সেবা ধর্ম্মজীবনকে স্ফূর্ত্তি দান করিয়া পরিণতির দিকে চালিত করে। উচ্চ বিষয়ক চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র গঠন ও সেই সব ভাব নিচয়ের একীকরণ, পুস্তক মধ্যে প্রতিফলিত করণ, ধর্ম্মপথের ক্রমোন্নতি বিধায়ক। যে শ্রেণীর লেখক এই কথাটী ভুলিয়া গিয়া গ্রন্থাদি প্রকাশিত করেন, সে শ্রেণীর লেখকের গ্রন্থ মধ্যে সৎ চিন্তার অবিরল স্রোত প্রবাহিত হয় না। যদিও দৈব কারণে দুই এক স্থানে ইহার বৈপরীত্য দৃষ্ট হয়, যখন জ্ঞানবত পাঠক ঐ সব লোকের চরিত্র বিষয় চিন্তা করেন, তখনই তাঁহাদের পুস্তকস্থিত ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক উপদেশ পাওয়ার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া পুস্তকখানি ফেলিয়া রাখিয়া দেন। লেখকের ইহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের ও ঘৃণার বিষয় কি থাকিতে পারে?

গ্রন্থকারের সঙ্গে যখন গ্রন্থের নৈকট্য সম্বন্ধ, তখন সকলেই যে গ্রন্থকারের আসনে উপবিষ্ট হইবার যোগ্য নহেন, একথা বোধ হয় স্বীকার্য্য। তাই ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও স্বর্গীয় গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী প্রভৃতি লেখকগণ, গ্রন্থকারের গুণলব্ধ হইয়া গ্রন্থাদি প্রকাশ করায়, বঙ্গ-সাহিত্য-সেবীর আরাধ্য হইয়া পড়িতেছেন। ইঁহারা কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে বিশেষ চিন্তা করিয়া, তাহার ফলাফল বিচার করিয়া, কিছু কিছু বা নিজ জীবনে প্রতি-

ফলিত করিয়া বলিতে অভ্যস্ত, তাই ইঁহাদের কার্য্যের অস্থি মজ্জার সঙ্গে উপদেশাবলীর প্রতি ক্রিয়া প্রকাশমান। যখনই পুস্তক পাঠ করিয়া ইঁহাদের জীবনের দিকে তাকাই, তখনই দেখিতে পাই, তাঁহাদের পুস্তকস্থিত ধর্ম্মপূর্ণ বাক্যাবলীই যেন চালকরূপে তাঁহাদিগকে অভীষ্ট পথে লইয়া যাইতেছে। কি আশ্চর্য্য শিক্ষা, মানবহৃদয়ে শিক্ষার আধিপত্যই বা কি আশ্চর্য্য!! গ্রন্থপাঠ কর, তাহাতেও মুগ্ধ হইবে, উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইবে, চরিত্র বিষয় জ্ঞাত হওয়ার জন্য কার্য্যাবলী প্রত্যক্ষ কর, উহা হইতে পুস্তক পাঠেরই ফল প্রাপ্ত হইবে। ঈদৃশ লেখক হওয়া সাধারণ সাধনার কর্ম্ম নহে। এই লেখক-সম্প্রদায় উচ্চ অঙ্গের সাধক। উঁহারা প্রেমময় ও পরোপকারী, বিশেষতঃ সমাজের উচ্চ শিক্ষাদাতা। গিরিজাপ্রসন্ন এই সম্প্রদায়ভুক্ত, কাজেই তাঁহার চরিত্রে বিশেষত্ব আছে। আমরাও সেই বিশেষত্ব দেখাইবার জন্য, তাঁহার জীবনচরিতের সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকাবলীর আলোচনা করিয়া যাইব। পাঠকবর্গ দেখিবেন, অনেক স্থলে তাঁহার চরিত্রের ছায়াই পুস্তক, আবার পুস্তকের ছায়াই চরিত্র মধ্যে প্রতিবিম্বিত। আজকালকার দিনে, এরূপ ধার্ম্মিক লোক লেখক-শ্রেণীর মধ্যে বিরল। গিরিজাপ্রসন্ন চরিত্রবলে লেখক-সম্প্রদায়ের পদের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, তাই তাঁহার নির্ম্মল ও সাধুজীবনের কয়েকটী ঘটনা প্রকাশের আবশ্যকতা বোধ করিয়া সেই কার্য্যে ব্রতী হইলাম।

বংশ পরিচয়।

বরিশাল জেলার সিদ্ধকাঠী গ্রামের বৈদ্য রায় চৌধুরী বংশ ধনে মানে প্রসিদ্ধ। ইঁহারা কুলগৌরবে বৈদ্যদিগের মধ্যে যেরূপ সম্মানিত, সম্পত্তি ও সৎকার্য্যেও সেইরূপ সম্ভ্রান্ত। এই প্রসিদ্ধ বংশে সিদ্ধকাঠীর নিজ বাটীতে ১২৬৮ সালের চৈত্র মাসে গিরিজাপ্রসন্ন জন্মগ্রহণ করেন।

এসময় তাঁহার পিতামহ দুর্গাপতি রায় চৌধুরী জীবিত ছিলেন। পিতা মথুরানাথ রায় চৌধুরীও নিজ বাটীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

আকস্মিক বিপদ।

আমাদের দেশে, কি ভিন্ন দেশে, যাঁহারা পরিণত বয়সে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, তাঁহাদের বাল্যজীবনের ২।১টা মহৎ বা বিপজ্জনক ঘটনায় প্রায়ই তাঁহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের ছায়া প্রতিফলিত থাকে। চৈতন্য, কেশবচন্দ্র সেন, রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র, ওয়াসিংটন, থিওডার পার্কার প্রভৃতি মহাপুরুষগণের জীবনচরিত পাঠ করিলে, এই উক্তির সমর্থনকারী যথেষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করা যায়।

গিরিজাপ্রসন্নের বয়স যখন ৫।৬ বৎসর, তখন তিনি একদা ১৭।১৮ হাত উচ্চ গৃহের ছাদ হইতে নীচে পড়িয়া যান। এরূপ উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইলেও তাহার জীবনের কোন অনিষ্ট ঘটে নাই। বিধাতা বোধ হয় তাঁহার চরিত্রগত মাধুর্য্যের নিদর্শন দেখাইবার জন্যই তাঁহাকে জীবিত রাখিয়াছিলেন।

পিতৃ মাতৃ গুণ।

গিরিজাপ্রসন্নের পিতা বরিশালে একজন ধার্ম্মিক জমীদার বলিয়া বিশেষ খ্যাত। কেবল দান ধ্যান দ্বারা তিনি এ সুনাম অর্জ্জন করেন নাই। এই সুনামার্জ্জনের প্রধান কারণ তাহার সত্যপ্রিয়তা ও স্বার্থত্যাগ। মথুরানাথের অনেক মহত্ত্বসূচক

ঘটনা আমরা জ্ঞাত আছি। তৎসমুদয় উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তিনি জমীদার ছিলেন, জমীদারী কার্য্যে তিনি কিরূপ ধর্ম্মানুরক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা এখানে কিঞ্চিৎ বলিতে চেষ্টা করিব। জমীদারগণ বিষয় রক্ষার জন্য অনেক সময় প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে বিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। নানারূপ মোকর্দ্দমায়ও তাহাদের ব্যাপৃত থাকিতে হয়। ঐসব ঘটনার মধ্য হইতে তাহাদিগের জীবনের সারাংশ বাছিয়া লওয়া যাইতে পারে। মথুরানাথ ভূম্যধিকারী। তাঁহাকেও নানারূপ লোকের সঙ্গে বিবাদে ও নানারূপ মোকর্দ্দমায় অনেক সময় জড়িত থাকিতে হইয়াছিল। ঐসব কার্য্যই অনেকের পতন-দ্বার মুক্ত করিয়া দেয়, কিন্তু মথুরানাথের উহা উত্থানের কারণ হইয়াছিল। তিনি কদাচ বাহিরে বা আদালতে মিথ্যা কথা বলিতেন না। কাহারও সঙ্গে মোকর্দ্দমা উপস্থিত হইলে, বিপক্ষীয় দল তাহাকে সাক্ষী মানিয়া দিত, তাহাদের হৃদয়ে ভয় ছিল না যে, মথুরানাথ বিরুদ্ধপক্ষ, অতএব স্বার্থসাধনের জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া নিজে জয়ী হইবেন। বরিশালের বিচারকগণ, তাঁহাকে বিশেষ সত্যবাদী বলিয়া জানিতেন ও তজ্জন্য তাঁহাকে কোর্টে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিতেন। বরিশালের স্বনামধন্য দেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত এম্-এ, বি-এল্ মহাশয় মথুরানাথকে এই সত্যনিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট প্রশংসা করেন। এমন কি, লোকের নিকট বলিয়া থাকেন, "মথুরানাথ স্বয়ং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ছিলেন।" বোধ হয়, অশ্বিনী বাবুর এই উক্তি দ্বারাই মথুরানাথের মহত্ত্ব পরিস্ফুটিত হইয়াছে।

একবার বরিশালে কোন মোকর্দ্দমা উপলক্ষে পরলোকগত উকীল ৺গোরাচাঁদ দাস বি-এল মহাশয় মথুরানাথের বিপক্ষে মনোনীত হয়েন, ও কূট প্রশ্নদ্বারা মথুরানাথের নিকট হইতে অনেক কথা বাহির করিয়া মক্কেলকে জয়ী করেন। মথুরানাথ সত্য সাক্ষ্য প্রদানের জন্য বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েন। মোকর্দ্দমার পর গোরাচাঁদ দাস উকীল মহাশয় নিতান্ত অনুতপ্ত হইয়া মথুরানাথের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করেন এবং বলেন যে "আপনার ন্যায় ধার্ম্মিক পুরুষ যদি এই সহরে বাস করিত, তাহা হইলে তাঁহার পাদোদক গ্রহণ না করিয়া, আমি অন্য কিছু গ্রহণ করিতাম না। এরূপ যিনি সত্যপ্রিয়, তাঁহার নিকট কূট প্রশ্ন করা পাপের কার্য্য। আমি অর্থলোভে আপনার সঙ্গে অভদ্রোচিত ব্যবহার করিয়াছি, তজ্জন্য ক্ষমা চাহিতেছি।"

গিরিজাপ্রসন্নের মাতৃদেবী অত্যন্ত স্নেহশীলা ও প্রতিবেশীগণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিনী ছিলেন। তিনি গরিবের কন্যা, কিন্তু শুভাদৃষ্টের ফলে ঐশ্বর্য্যের কর্ত্রী হইয়াছিলেন। সাধারণতঃ অবস্থার এরূপ পরিবর্ত্তনে অনেক স্ত্রীলোক গর্ব্বিতা হইয়া থাকেন। গিরিজাপ্রসন্নের জননী এসব দোষের অতীত ছিলেন, তাঁহার দয়া এত প্রবলা ছিল যে, তিনি সর্ব্বদাই পরের দুঃখমোচনের জন্য যত্নবতী ছিলেন। তাঁহার এই সদ্গুণটীর জন্য দেশস্থ সকলেই তাঁহাকে প্রশংসা ও ভক্তি করিতেন। অনেকে বলিয়া থাকেন, পিতৃমাতৃ গুণ পুত্রের চরিতে অনুপ্রবিষ্ট হয়, গিরিজাপ্রসন্নও এরূপ সৎ পিতামাতার অনেকগুলি গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন।

প্রতিভার পরিচয়।

গিরিজাপ্রসন্নের শৈশবকালের শিক্ষক শ্রীযুক্ত হরনাথ রায় মহাশয় বলিয়াছেন "আমি

প্রায় ৪০ বৎসরের অধিক কাল শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত আছি, আমার ছাত্র অনেকেই কলেজে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া শিক্ষিত হইয়াছেন, কিন্তু গিরিজাপ্রসন্নের ন্যায় প্রতিভাশালী ছাত্র আমার হাতে আর পড়ে নাই। কোন জটিল বিষয়—গণিতই হউক বা সাহিত্যই হউক—তাহার হৃদয়ঙ্গম করার জন্য একাধিকবার আয়াস করিতে হয় নাই। সকল প্রকার দুরূহ বিষয় তাঁহার নিকট জলের ন্যায় তরল প্রতীত হইত।" শিক্ষকেরই এই উক্তিই বোধ হয় তাঁহার প্রতিভার যথেষ্ট পরিচায়ক।

নৈশ বন-ভোজন।

বাল্যকালে গিরিজাপ্রসন্নের স্বভাব চঞ্চল ছিল। সমপাঠিগণের সঙ্গে তাঁহার অতিশয় সৌহার্দ্দ ছিল। তিনি বাল্যকালে উহাদের সঙ্গে একত্রিত হইয়া সুস্বাদু লিচু, জাম, নারিকেল, শশা প্রভৃতি সংরক্ষিত দ্রব্য বাগান হইতে পারিয়া খাইতে ভালবাসিতেন। কখন কখন বা নৈশ বন-ভোজনের উদ্যোগ করিয়া রজনী ভাগে আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের ঘরে প্রস্তুত পিষ্টকাদি আহারীয় দ্রব্য ভোজন করিতেন। গিরিজাপ্রসন্নের এইরূপ বালসুলভ চপল ব্যবহারে অথচ অসাধারণ সরলতায় অনেকেই অসন্তুষ্ট হইতেন না, বরং তাহাদের নৈশ বন ভোজন যাহাতে পরিতোষকারী হয়, অজ্জনা গৃহস্বামী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বালকগণের প্রিয় গৃহরক্ষিত খাদ্যাদি গিরিজাপ্রসন্নকে দিয়া প্রফুল্লিত হইতেন। তাহার প্রিয় ব্যবহার ও বাকপটুতা সকল শ্রেণীর লোকের হৃদয় আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইত। বালকগণ মিলিয়া মিশিয়া যে সব কার্য্য করে, তাহা কত মধুর, এদেশের লোক তাহা কল্পনা করিতে অনভ্যস্ত নহেন।

ক্রীড়ানুরক্তি।

গিরিজাপ্রসন্নের দেহ বাল্য কাল হইতেই সবল ছিল, তিনি নির্ভীক ছিলেন। হাডুগ্-ডুগ্ ও ক্রীকেট খেলায় তিনি নির্ভীক ছিলেন। এমন কি, এই সময় বালসঙ্গীদের সঙ্গে একত্রিত হইয়া গ্রামের ২।৩ মাইল বাহিরে ম্যাচ খেলিতে যাইতেন।

তাহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায়, শারীরিক শক্তি বলে, বাক্যের মনোহারিত্বে, প্রীতির বিনিময়ে, তিনি ঐ সমস্ত দলের সহজেই নেতৃত্ব লাভ করিতেন।

ঘুড়ি উড়ানেতে গিরিজাপ্রসন্নের বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল। এক একবার তিনি ঘুড়ি উড়াইতে এত মত্ত হইয়াছিলেন যে, তজ্জন্য সময়োচিত আহার নিদ্রা ভুলিয়া গিয়া সঙ্গিগণ সমভিব্যাহারে মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। সঙ্গীরা তাঁহার সদাশয়তায় এত মুগ্ধ হইয়া পড়িত যে, প্রাণান্তেও উহারা তাঁহার সঙ্গ ত্যাগে সম্মত হইত না। লোককে কিরূপ পরাজয় করিয়া যশের মুকুট শিরে ধারণ করিব, এরূপ একটা প্রবল কামনা-বীজ গিরিজাপ্রসন্নের হৃদয়ে এই সময় অঙ্কুরিত হইয়াছিল। যৌবনে বুঝিয়াছিলেন, বাহিরে লোক জয় করিয়া যশস্বী হওয়া অতি তুচ্ছ। ভিতরের জয়ই বীরত্বের পরিচায়ক। যে জয় লাভের বাসনা বাল্যে তাহাকে বহির্জগতে নিযুক্ত করিয়াছিল, সেই জয়লাভের বাসনাই তাহাকে যৌবনে অন্তর্জ্জগতের উপর আধিপত্য বিস্তারে অত্যন্ত সাহায্য করিয়াছিল। তাঁহার চরিত্রের একটা প্রধান উপাদান ছিল—বিজয়-তৃষ্ণা। আমি মনে করি, এই তৃষ্ণাটাই তাহাকে সর্ব্ববিধ উন্নতির দ্বার মুক্ত করিয়া দিয়াছিল।

সোদর-বাৎসল্য।

সহোদরদের প্রতিও তাঁহার প্রগাঢ় বাৎসল্য ভাব—অনেক কার্য্যে বিকশিত হইয়াছে। তিনি খেলিবার সময় তাহার মধ্যম সহোদরকে তাঁহার বিরুদ্ধ দলে রাখিয়া ক্রীড়াভিজ্ঞতা দেখাইতেন। তিনি বলিতেন যে, ক্রীড়াসঙ্গিগণের মধ্যে তাহার মধ্যম ভ্রাতা ভিন্ন কেহই তাহার প্রতিযোগী হইবার স্পর্দ্ধা রাখে না—দুই ভ্রাতার মধ্যে যথেষ্ট সদ্ভাব ছিল, উভয় ভ্রাতার মধ্যে আবার সময় সময় মনোমালিন্য ঘটিত, কিন্তু তাহা ক্ষণস্থায়ী। শরতের বৃষ্টি মুহূর্ত্তে আসিত, আবার মুহূর্ত্ত মধ্যে অপসারিত হইত। এই অনুজের কোন কোন গুণে এত মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, গিরিজাপ্রসন্ন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন, আমার মধ্যম ভ্রাতা উৎকৃষ্ট যোদ্ধা, কার্য্যকুশল ও বন্ধুবর্গের আনন্দবর্দ্ধক।" গিরিজাপ্রসন্নের এই গুণ গ্রহণের ক্ষমতা বাল্যকাল হইতেই উন্মেষিত হইয়াছিল।

বন্ধুত্ব।

সমবয়স্কদের সঙ্গে তাহার বিলক্ষণ সদ্ভাব ছিল। বরিশালের প্রসিদ্ধ কবিরাজ ৺ বিপিন বিহারী রায়, ডাক্তার রমাপ্রসন্ন রায় ও নবীন চন্দ্র রায় তাহার বাল্যবন্ধু ছিলেন। ইহাদের কাহারও আচার ব্যবহার শেষে অপ্রীতিকর হইলেও, গিরিজাপ্রসন্ন কখন ইহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। গিরিজাপ্রসন্ন প্লেগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইবার সময়, তাহার বাল্যবন্ধু রমাপ্রসন্ন রায় মহাশয় যেরূপ সেবা-শুশ্রূষা করিয়া বন্ধুত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বিস্ময়কর। তাঁহার ঋণ অপরিশোধনীয়। বিপদে বন্ধুর কি আবশ্যকতা, তাহা রমাপ্রসন্ন বাবুর কার্য্যে বেশ প্রতীয়মান হইয়াছে।

লোভ দমন।

গিরিজাপ্রসন্ন নিজ ভবনের স্কুলে পাঠ করিয়া বরিশাল গমন করেন। সেখানে তিনি জেলা স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন। এই সময় তাঁহার হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ পায়। তিনি বাল্যকাল হইতেই অপবিত্র জিনিষ ভক্ষণ করিতেন না। এমন কি, রসনার পরিতৃপ্তিদায়ক—পাঠ্য জীবনের পরম আশ্রয়—দোকানদারের মিঠাই শারীরিক ও মানসিক উন্নতির অন্তরায় বোধে উপেক্ষা করিতেন। যৌবনের প্রারম্ভেই লোভ-দমনের জন্য রসনা সংযত করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

গিরিজাপ্রসন্ন বরিশালে এণ্ট্রেন্স ক্লাশ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া কলিকাতায় গমন করেন। সেখানে সিটি কলেজিয়েট স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েন। এফ্‌ এ পড়িবার জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হয়েন। এই সময় সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাঁহার বিশেষ মনোযোগ আকর্ষিত হয়। সিটি কলেজের প্রাচীন সংস্কৃতাধ্যাপক পূজনীয় শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহাকে প্রাইভেট সংস্কৃত পড়াইয়া ঐ ভাষায় তাঁহার ব্যুৎপত্তি জন্মাইয়া দেন। উক্তপণ্ডিত মহাশয় একদিন আমাদের নিকট গল্পচ্ছলে প্রকাশ করিয়াছেন "গিরিজাপ্রসন্ন আমার নিকট সংস্কৃত পাঠাভ্যাসকালে এতদূর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও ধারণাশক্তির পরিচয় দিয়াছিল যে, তাহার দ্রুত উন্নতি দৃষ্টি করিয়া আমি প্রকৃতই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। যখন আমি তাহাকে প্রথম পড়াইতে আরম্ভ করি, তখন তাহার সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ জ্ঞানের পরিচয় না পাইলেও, কিছুকালের মধ্যেই সে আশাতীত জ্ঞানলাভ করিয়াছিল।"

বিবাহ।

গিরিজাপ্রসন্নের পিতামহ দুর্গাগতি রায় চৌধুরী মহাশয় অতি বৃদ্ধ বয়সে মানব-দেহ পরিত্যাগ করেন। তিনি পৌত্রের বাল্যভাব দর্শন করিয়াই ধারণা করিতে পারিয়াছিলেন—পৌত্র কোন এক সময় তাঁহার বংশ উজ্জ্বল করিতে পারিবে। তিনি মৃত্যু শয্যায় শায়িত হইয়া পৌত্রের বিবাহ দিতে সংকল্প করিলেন। বৃদ্ধের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল।

গিরিজাপ্রসন্ন ষোড়শ বর্ষ বয়সে পরিণীত হইলেন। দুর্গাগতি রায় একজন তীক্ষ্ণ বুদ্ধির লোক ছিলেন, এতদ্দেশে প্রচার—তাঁহার ন্যায় বিষয়ী ও কৌশলী লোক, বরিশাল জেলার জমীদার-শ্রেণীর মধ্যে তৎকালে দুষ্প্রাপ্য ছিল। তিনি মৃত্যুর ২।৪ দিবস পূর্ব্বে পৌত্র ও পৌত্রবধূকে ডাকিয়া সংসার ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশচ্ছলে অনেক কথা বুঝাইলেন এবং পৌত্রবধূকে বলিয়া গেলেন "মা, তুমি যে সাররত্ন পাইয়াছ, কদাচ তাহার অনাদর করিও না। এই বৃদ্ধই যে তোমার এই রত্ন লাভের অনেকটা কারণ, তাহা বিস্মৃত হইও না।" বৃদ্ধের এ উক্তি কালে ফলবতী হইয়াছিল।

গিরিজাপ্রসন্নের পত্নী পরমাসুন্দরী ছিলেন না। গিরিজাপ্রসন্ন রমণীহৃদয়ে যে সৌন্দর্য্য ফুটাইবার জন্য লালায়িত ছিলেন, তাঁহার পত্নীর হৃদয়ক্ষেত্রে সে সৌন্দর্য্য ফুটিয়াছিল। বিনয়, নম্রতা, লজ্জা, দয়া প্রভৃতি সদ্‌গুণ তাহার পত্নীর চরিত্রের প্রধান উপাদান ছিল। বিবাহ সময়ে ইনি লেখা পড়া জানিতেন না, গিরিজাপ্রসন্নই ইহাকে লেখাপড়া শিক্ষা প্রদান করেন। এই শিক্ষার ফলে ইনি এক জন শ্রেষ্ঠা গৃহিণী ও বিদুষী বলিয়া পরিগণিতা হইয়াছিলেন। গিরিজাপ্রসন্নের ভার্য্যার হৃদয়ে অনেকগুলি গুণ উন্মেষিত হইলেও, তাহার একটী দোষের জন্য পতিকে বড় উদ্বেগ ভোগ করিতে হইত। তাঁহার সে দোষটী কোপনস্বভাব। গিরিজাপ্রসন্নের উপদেশে সে দোষটী নিরাকৃত হইয়াছিল। দম্পতির মধ্যে অকৃত্রিম ভালবাসা জন্মিয়াছিল। গিরিজাপ্রসন্ন কর্ত্তব্য বা ভালবাসারই বিশেষ পক্ষপাতী। কাজেই পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ভালবাসা স্থাপনে বিশেষ গোলযোগে পড়িতে হয় নাই। গিরিজাপ্রসন্নের এই বাল্য বিবাহ তাঁহার অধ্যয়নের অনেক বিঘ্নোৎপাদন করিয়াছিল। এই জন্যই বোধ হয়, তাহার প্রথম বয়সের সন্তানগুলি অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। গিরিজাপ্রসন্ন কখনও পুরুষদের বাল্যবিবাহ অনুমোদন করিতেন না। তিনি "গৃহলক্ষ্মী"তে এতদ্বিষয় যাহা বলিয়া গিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

"শুদ্ধ ভালবাসার জন্য যদি বাল্য বিবাহ মন্দ হইত, আমি গ্রাহ্য করিতাম না। কিন্তু এতদ্ভিন্ন অনেক কারণে বাল্যবিবাহ ভাল নহে। এইটী পুরুষদের পক্ষে, বালিকার কথা স্বতন্ত্র, তাহাদের বাল্যবিবাহে অপকারের অংশ অপেক্ষা উপকারের অংশ অধিক।" *

থিয়েটার অভিনয়।

বর্ত্তমান সময় অনেকে রঙ্গালয়ের অভিনয় দর্শন করিয়া বিরক্তি প্রকাশ করেন। প্রাচীন কালে যে সমস্ত সৎউদ্দেশ্য পূর্ণ গ্রন্থ অভিনীত হইত, আজ কাল নাট্যশালায় প্রায়ই সে সব পুস্তকের নাম নাই। নাটক অভিনয়ের উদ্দেশ্য "চিত্তরঞ্জনী বৃত্তির" পরিস্ফুরণ, ও

* গৃহলক্ষ্মী প্রথম ভাগ—বিবাহ প্রবন্ধ, পৃঃ ১৭০।

মানব জীবনের জটিল সমস্যাগুলি ব্যাখ্যাত করিয়া লোককে শিক্ষাপ্রদান।

গিরিজাপ্রসন্ন কলিকাতা অধ্যয়ন কালে থিয়েটার দর্শন করিতেন। গ্রীষ্মাবকাশে বা অন্য কোন ছুটী উপলক্ষে তিনি দেশে আসিয়া থিয়েটার-অভিনয় করিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিয়োগের পর একবার তিনি হরিশ্চন্দ্রের অভিনয় করিয়াছিলেন, সকলেই তাঁহার অভিনয় দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল। তিনি উক্ত কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাহার মৃত্যুর ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে একবার দেশে কবি-বর রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের "প্রহ্লাদ-চরিত্র" অভিনীত হয়। গিরিজাপ্রসন্ন ভক্তবীর প্রহ্লাদের মুখে মধুর হরির নাম শ্রবণের জন্য অন্যান্য কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ঐ নাটকের Rehearsal এর ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার অনুকম্পায় প্রহ্লাদ অভিনয়কারী, দর্শকের হৃদয়ে অপূর্ব্ব ভক্তিরস সঞ্চারিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অভিনয়ের বিষয়গুলি যাহাতে দোষশূন্য ও শিক্ষাপ্রদ হয়, তজ্জন্য তাহার উপর গিরিজাপ্রসন্নের তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল।

পুস্তক পাঠ করিয়া যে সমস্ত ঘটনা অবগত হওয়া যায়, তদপেক্ষা ঐ সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষীভূত হইলে যে প্রভূত পরিমাণে শিক্ষা লাভ করা যায়, একথা বোধ হয় সর্ব্ববাদী-সম্মত। আমরা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের জীবন-চরিতে দেখিতে পাই—তিনি থিয়েটার-অভিনয়ে বিশেষ অনুরক্ত ও সুদক্ষ ছিলেন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

জন্মান্তর, কর্ম্ম এবং আত্মোন্নতি।

জীব চারি শ্রেণীতে বিভক্ত, জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জ। জীব মাত্রই জন্ম মৃত্যুর অধীন। মৃত্যুই জীবের পরিণতি, কি প্রবাহ ক্রমে পুনঃ পুনঃ তাহাদিগকে জন্ম মৃত্যুর অধীনে আসিতে হয়? চারি শ্রেণী জীবের মধ্যে এক শ্রেণীস্থ জীবের শ্রেণ্যন্তরে পরিণত হইয়া সম্ভবে কিনা? পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর কারণই বা কি? জন্ম মৃত্যুর অধীনতা হইতে জীবের নিষ্কৃতি আছে কিনা? আত্মোন্নতিই বা কি? এই সকল সমস্যার আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

জীব জগতে মানবই প্রাথমিক অথবা মানবেতর জীবই প্রাথমিক, সৃষ্টির ক্রম অনুসারেই তাহার পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণীত হয়। আলোচ্য বিষয়ে ইহার প্রাসঙ্গিকতা থাকায়, তাই কিঞ্চিৎ বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

"আকাশাজ্জায়তে বায়ুর্বায়োরুৎপদ্যতে রবিঃ।
রবেরুৎপদ্যতে তোয়স্তোয়াদুৎপদ্যতে মহীঃ॥"

বিশ্বসিসৃক্ষু ঈশ্বর প্রথমে শব্দ গুণময় সূক্ষ্মভূত আকাশ (ইথার) সৃষ্টি করিলেন। তাহা হইতে শব্দ স্পর্শ গুণময় বায়ু। বায়ু হইতে রবি অর্থাৎ তেজঃ। ইহার গুণ তিনটী, শব্দ, স্পর্শ ও রূপ। তেজঃ হইতে জল, ইহা শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস গুণাত্মক।

জল হইতে মহী অর্থাৎ মৃত্তিকার উৎপত্তি। ইহা শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, রস ও গন্ধ গুণময়। মৃত্তিকার পূর্ব্বে সৃষ্টি জল, সুতরাং স্থলচর জীবের পূর্ব্বেই যে জলচর জীবের সৃষ্টি তাহার সন্দেহ নাই। অবতার তত্ত্বে প্রথম ও দ্বিতীয়াবতার জলচর মৎস্য ও কূর্ম্ম। জল হইতে মৃত্তিকার উদ্ভব হইলে অরণ্য জীবের উৎপত্তিই সম্ভব। উক্ত সময়ে, তৃতীয়াবতার

বরাহ। তৎপরে মানুষ ও পশুর মিশ্রিত মূর্ত্তি নৃসিংহ চতুর্থাবতার। নৃসিংহ ক্রম বিকাশের নিয়মাধীন নয়। সুতরাং ইহা দার্শনিক মতের পরিপোষক নহে। মানুষ সৃষ্টির বহু পরে হিরণ্যকশিপুর বিনাশার্থ নৃসিংহাবতার। যাহা হউক, মনুষ্য সৃষ্টির পূর্ব্বেই যে ইতর জীবের সৃষ্টি হয়, ইহা প্রমাণীকৃত হইতেছে। পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিত ডাবউইন সাহেব বলেন, বানরের উৎকর্ষই মানুষ। হিন্দু দর্শনেও ক্রমোৎকর্ষ অস্বীকৃত হয় নাই। পাতঞ্জল দর্শন বলেন—

"জাত্যন্তর পরিণামা প্রকৃত্যা পূরাৎ॥"

জীব ক্রমে উৎকর্ষ লাভ করিয়া এক জাতি হইতে জাত্যন্তরে পরিণত হয়। বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র উইর মধ্যে একটা অঙ্গুষ্ঠ-প্রমিত দেহ দেখা যায়। ক্ষুদ্র উই ক্রমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া বৃহৎ হইয়াছে। উহা এক জাতিই বটে, কিন্তু ঐ রূপেই জাত্যন্তরেও পরিণত হওয়া অসম্ভব নয়।

আমরা কর্ম্ম-ফল-বাদী। উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট যোনিত্ব, সুখ দুঃখ সমস্তই কর্ম্মজনিত ফললব্ধ। ইহা হিন্দু দর্শনের স্থির সিদ্ধান্ত। চতুর্ব্বিধ জীবই কর্ম্মফলাধীন। কিন্তু এক গুরুতর প্রশ্ন হইতে পারে যে, ইতর জীবই যখন আদিম সৃষ্ট, তখন কর্ম্মফল কোথা হইতে আসিল? ইতর জীবের যখন ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম নাই, তখন কর্ম্মফলও নাই। বিশেষতঃ প্রথম সৃষ্ট জীবের কর্ম্মফল কিরূপে সম্ভবে? দর্শন-শাস্ত্র এ প্রশ্নোত্তর দানে একরূপ অসমর্থ। সৃষ্টি অনাদি, অনন্তবার এই বিশ্বের সৃষ্টি এবং ধ্বংস হইয়াছে। প্রলয়ান্তে কর্ম্ম সূক্ষ্ম বীজ ভাবে থাকে। তাহা হইতে আবার জীবের সৃষ্টি হয়। সকলের গোড়া খুঁজিয়া পাইবার যো নাই। উহা বীজাঙ্কুরবৎ। বীজ ও অঙ্কুরের যেমন অগ্র পশ্চাৎ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য, তেমনি কর্ম্ম ও জীব সম্বন্ধে। যাহা অনন্ত, তাহার ধারণাই, সুতরাং নাই। কর্ম্ম জীব-সৃষ্টির বীজ নয়, এ কথা অস্বীকৃত হইতে পারে না। প্রত্যেক জন্ম কর্ম্ম ফলানুসারিণী গতি-বিশিষ্ট।

... জগৎ পরিণামশীল, * এ কথা জড় জগৎ সম্বন্ধে যেমন, জীব জগৎ সম্বন্ধেও তেমনি। সূক্ষ্ম আকাশ যেমন, স্থূল জড় প্রপঞ্চে পরিণত, তেমনি জীবও জীবান্তরে পরিণত হইতেছে। জড় পরিণতির নিদান প্রকৃতি, জীব পরিণতির নিদান কর্ম্ম। প্রকৃতি জড়, সুতরাং জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি তাহাতে নাই। এবং জড় হইতে চৈতন্যের উৎপত্তিও অসম্ভব। মানুষ কর্ম্মফলে নিকৃষ্ট জীব হইতে পারে এবং নিকৃষ্ট জীবও কর্ম্মজনিত ফল ভোগের শেষে পুনর্ব্বার উৎকৃষ্ট জীব হইতে পারে। মানুষ ভাল মন্দ কর্ম্ম করে এবং তজ্জনিত ভাল মন্দ দ্বিপ্রকার ফলই প্রাপ্ত হয়। কর্ম্ম থাকে না, কিন্তু কর্ম্মজন্য ফল থাকে। পাপ পুণ্য কর্ম্মেরই ফল এবং এই কর্ম্মফলেই মানব-জগতে এত বৈষম্য বর্ত্তমান। কর্ম্মজনিত যে সংস্কার, তাহাই কর্ম্মফল বা অদৃষ্ট।

শরীর ত্রিবিধ, স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ। মতান্তরে মহা কারণ চতুর্থ শরীররূপে উক্ত হইয়াছে। সূক্ষ্ম শরীরকে লিঙ্গ শরীরও বলে। স্থূল শরীর এই জড় দেহ। সূক্ষ্ম শরীর সপ্তদশ অবয়বা। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণবায়ু, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ * কারণ শরীর মূল প্রকৃতি। যোগিগণ যোগবলে সূক্ষ্ম শরীরকে দেহ হইতে বাহির করিতে পারেন। এই সূক্ষ্ম শরীরই দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে। সূক্ষ্ম শরীরই ভোক্তা। সুখ, দুঃখ, শুভাশুভ এই সূক্ষ্ম শরীরই ভোগ করে। জীবাত্মার নিত্য সান্নিধ্য হেতু বর্ত্তমান। সুতরাং জড় হইলেও চৈতন্যবৎ। সাংখ্য মতে ইন্দ্রিয় ভৌতিক নহে, আহঙ্কারিক। ঈশ্বরের তমোগুণের সৃষ্টি ভূত, রজোগুণের সৃষ্টি ইন্দ্রিয় এবং সত্ত্বগুণের সৃষ্টি দেবতা। অতএব ইন্দ্রিয় ভূত হইতে পৃথক। চক্ষু হইতে কতক গুলি কিরণ (রেখা) নির্গত হইয়া বস্তুর উপরে পতিত হয়।

* শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বেদান্তসূত্রের পরিণামবাদে দোষার্পণ করিয়া বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু কাশীস্থিত পণ্ডিতগণকে উহার ভ্রান্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক ব্যাস সূত্রের পরিণামবাদ সমর্থন করেন অর্থাৎ ব্রহ্মই জগতে পরিণত হন, কিন্তু স্বরূপে বিবর্ত্তিত হন না।

* মতান্তরে পঞ্চপ্রাণ বায়ু স্থলে পঞ্চ বিষয়যুক্ত লইয়া সপ্তদশটী গৃহীত হয়।

ঐ কিরণ রেখার মধ্য দিয়া বস্তুর প্রতিবিম্ব স্নায়ুতে আসিয়া দৃষ্টি জ্ঞান জন্মায়। জড় হইলে কিরণ রেখার মধ্য দিয়া জ্ঞান সম্ভবে না। সুতরাং ইন্দ্রিয় আহঙ্কারিক। ঠিক চৈতন্যও নয়, জড়ও নয়। যেন জড় চৈতন্যের মাঝামাঝি এক অনির্ব্বচনীয় শক্তি। অন্য দর্শনে ইন্দ্রিয়কে জড়ই বলা হইয়াছে। আমেরিক পণ্ডিতগণ নাকি মানব ফটো পর্য্যন্ত তুলিয়াছেন। ইহা কি প্রকার, তাহা তাঁহারাই জানেন। এক্ষণে মৃত্যু ও দেহান্তর সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।

যে যে স্থান জীবাত্মার নিবাস তাহাকে পুর বা পুরী বলে। পুরে শয়ন করেন জন্য জীবাত্মার নাম পুরুষ। নিম্নলিখিত ৮টী পুর বা পুরী।

"দেহেন্দ্রিয় মনো বুদ্ধি বাসনা কর্ম্মবায়বঃ
অবিদ্যা চাষ্টকং প্রোক্তং পুর্য্যষ্ট মৃষিসত্তমেব॥

মনুসংহিতা।

দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, বাসনা, কর্ম্ম বায়ু এবং অবিদ্যা এই আটটী স্থান আত্মার নিবাসপুরী। সুতরাং দেহের কোন অংশই আত্মার অনধিগম্য নয়। এক্ষণে দেখা যাউক, জীবাত্মা দেহ হইতে বাহির হইয়া কোথায় যায়। ক্রমশঃ। শ্রীজানকীনাথ গোস্বামী।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

২৫। উপনিষদের উপদেশ।—দ্বিতীয় খণ্ড (কঠ ও মুণ্ডক) শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন, এম-এ, প্রণীত।

উপনিষদের উপদেশ প্রথম খণ্ড যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অল্প সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় খণ্ড প্রাপ্ত হইয়া যে আনন্দ লাভ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা প্রথম খণ্ডের সমালোচনায় গ্রন্থের প্রশংসা করিয়াছিলাম, এবার দ্বিতীয় খণ্ড পাঠ করিয়া প্রাণের গভীর আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। গ্রন্থের ভূমিকায় বিদ্যারত্ন মহাশয় শঙ্করের দার্শনিক মতের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে উচ্চ-শিক্ষিত পাঠক-সমাজে মতভেদ হওয়া অসম্ভব নহে; কিন্তু একথা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, বিদ্যারত্ন কোকিলেশ্বর উপনিষদের উপাখ্যান সমূহ মধুর ও ওজস্বিনী ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া বঙ্গীয় সর্ব্বসাধারণ পাঠকের নিকট এক নূতন রাজ্যের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। এতদিন পরে প্রাচীন ঋষিগণের সাধন লব্ধ সম্পত্তি বঙ্গের গৃহে গৃহে বিতরণের আয়োজন হইয়াছে। আমরা আশা করি, বিদ্যারত্ন মহাশয় এইরূপে উপনিষদের সমুদয় উপদেশ, রামায়ণ ও মহাভারতের উপদেশ প্রভৃতি প্রচার করিয়া মহাব্রত উদ্‌যাপন করিবেন।

২৬। কমলাকান্তের জীবনচরিত।—প্রকাশক শ্রীহেমচন্দ্র সরকার, এম-এ, প্রফেসর, প্রেসিডেন্সী কলেজ। মূল্য ॥০। সাধু কমলাকান্তের জীবনচরিত—অতি উপদেয় পুস্তক। জীবিত কালে জীবনচরিত প্রকাশ করা সমীচীন নহে; কিন্তু সাধু ভক্তের তিরোধানের পর কে আর তাঁহাদের ভক্তিময় জীবন-কাহিনী প্রকাশ করিবে? এইজন্য জীবিত-কালে কমলাকান্তের জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া, আমরা, দুঃখিত না হইয়া বিশেষ সুখী হইয়াছি। দরিদ্র সাধুর জীবনের অমূল্য কাহিনী তাঁহার তিরোধানের পর কে আর প্রকাশ করিত? হেমচন্দ্র সরকার মহাশয় এই মহৎ কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া ভক্ত বিশ্বাসীদিগের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন। তাঁহার পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হইয়াছে। পুস্তকখানি অতি সুললিত বাঙ্গালায় লেখা। পাঠ করিলে সকলে বিশেষ সুখ লাভ করিতে পারিবেন।

২৭। হস্তলিপি-লিখন প্রণালী।—শ্রীশিব রতন মিত্র প্রণীত, মূল্য ।০। অতি যত্নের

সঙ্কিত শিবরতন বাবু এই পুস্তকখানি লিখিয়াছেন। শিশুদিগের লিখন প্রণালী অতি সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পুস্তকখানি সাচত্র। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। আশা করি, এই পুস্তকের খুব আদর হইবে।

২৮। অবসর। প্রথম খণ্ড।—শ্রীমতী ফুলকুমারী গুপ্ত প্রণীত, মূল্য ।০। এই পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা বিমল আনন্দ পাইলাম। ভূমিকায় সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত পাঁচ কড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন,

"দশ বৎসর পূর্ব্বে লেখিকা স্বদেশীয়তার যে ছবি আঁকিয়াছেন, তাহার সহিত বর্ত্তমান আন্দোলনের তুলনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। মনে হয়, বাণী তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া, ভবিষ্যতের অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া সত্যের বিকাশ করিয়াছিলেন।" এই কথাগুলি অতি সত্য। লেখিকার হৃদয়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিম্নের কবিতায় কিরূপ পরিস্ফুট হইয়াছে, পাঠক দেখুন।

"কি শিখিলি এত দিন বৃটনের দেশে,
এবে তাহা শেখা দেখি স্বদেশেতে এসে?
বাঁধিয়া একতা-সূত্রে,
অধম বঙ্গের পুত্রে,
নির্জ্জীব দেহেতে করি' জীবন সঞ্চার
যা শিখিলে এত দিন শেখা একবার,
শূরত্ব মহত্ব দর্প হৃদয়ের বল,
যাহা বিনে আজি বঙ্গ এত হীনবল,
বরষি সাহস বারি,
দুঃখ ভয় দে নিবারি,
রেষারেষি দ্বেষাদ্বেষি মনের খলতা,
ভুলাইয়া শেখা ভাই স্বজাতিপ্রিয়তা।"

লেখিকার ক্ষমতার পরিচয়ে আমরা প্রমুগ্ধ; তাঁহার হৃদয় অতি উদার, অতি সুনির্ম্মল। দিন দিন লেখিকার প্রতিভার স্ফুরণ হউক, বিধাতার নিকট আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

২৯। কাকলী।—শ্রীজগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত, মূল্য ৴০। ক্ষুদ্র পুস্তিকা। কোন বিশেষত্ব নাই।

৩০। স্বাস্থ্য-চিকিৎসা।—প্রথম খণ্ড, শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন কর্ত্তৃক প্রণীত, মূল্য ॥০। দেশীয় চিকিৎসার প্রণালী ইহাতে সুন্দরভাবে লিখিত হইয়াছে। এই পুস্তকের বহুল প্রচার হইলে দেশের বিশেষ উপকার হইবে;—অনেক অর্থ দেশে থাকিয়া যাইবে।

৩১। রচনা-সোপান।—শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী প্রণীত, মূল্য ১৲। এই পুস্তকে বাঙ্গালা বাক্য রচনা, প্রবন্ধ প্রণয়ন ও অনুবাদ সংক্রান্ত উপদেশ আছে। বাক্য রচনার মধ্যে বাক্যে পদবিন্যাস-প্রণালী, সরল যৌগিক জটিল প্রভৃতি নানাবিধ বাক্য, বাক্যের পরিবর্ত্তন, বাক্য বিস্তৃতি, রচনার রীতি (style) প্রভৃতির বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

প্রবন্ধ রচনাস্থলে প্রবন্ধের বিভাগ, বর্ণনা-বিষয়ক, ঘটনা বিষয়ক ও নীতি-বিষয়ক নানাবিধ প্রবন্ধ লিখিয়া দেখান হইয়াছে। প্রত্যেক প্রকার প্রবন্ধের শেষভাগে তত্তৎ প্রবন্ধ-বিষয়ক বহু প্রশ্ন আছে।

অনুবাদে বিবিধ উপদেশ ও উদাহরণ আছে।

পরিশিষ্ট ভাগে এণ্ট্রান্স ক্লাস হইতে এফ-এ ক্লাস পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকদের প্রদত্ত প্রশ্ন ও কৃতী ছাত্র ও ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক লিখিত উত্তর সন্নিবেশিত হইয়াছে।

গ্রন্থের বিষয় বিন্যাস-প্রণালী অতি সুন্দর। গ্রন্থের ভাষা প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট।

এই পুস্তক খানি, মোটের উপর, উপাদেয় হইয়াছে। ইহা দ্বারা ছাত্র ও ছাত্রীগণের বিশেষ উপকার হইবে। গ্রন্থকারকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি যে, তিনি এই মহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া সুচারুরূপে তাহা সম্পন্ন করিয়াছেন। এই পুস্তকের বহুল প্রচার প্রার্থনা করি।

গিরিজা প্রসন্ন। (২)

কয়েকখানি পত্র ও উত্তর।

গিরিজাপ্রসন্ন এফ-এ পড়ার সময় কয়েক খানি পত্র ও উত্তর প্রণয়ন করেন। এইখানি তাঁহার সর্ব্ব প্রথম গ্রন্থ। "পত্র ও উত্তরের" মূল উদ্দেশ্য রমণীগণকে লিপি-রচনা-কৌশল শিক্ষা দান। "পত্র ও উত্তরের" কথা শ্রবণ করিয়া কেহ যেন ধারণা করেন না যে, পত্রের আবার কি প্রকার সার নীতি বিষয়ীভূত হইতে পারে? স্বামী পত্রচ্ছলে স্ত্রীকে যে সব সার নীতি শিক্ষা দিয়াছেন, সে সব নীতি আমরা আমাদের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও জ্ঞানবৃদ্ধ লেখকের লেখায়ও কচিৎ খুজিয়া পাই। এই নবীন গ্রন্থকার সাহিত্য-সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াই কিরূপ রচনা-পটুত্ব দেখাইয়াছেন এবং কতদূর উচ্চ বিষয় চিন্তা করিয়াছেন, তাহা অবগত করাইবার জন্য বিবেক শীর্ষক প্রবন্ধের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"জগৎপাতা জগদীশ্বর বিবেক শক্তি প্রদান করিয়াই মনুষ্যগণকে তাঁহার সৃষ্টির প্রধান করিয়াছেন। এই শক্তি সকলেরই আছে। জ্ঞানী হইতে মূর্খ পর্য্যন্ত সকলেই সমান অংশে এই শক্তি-সম্পন্ন। আমরা যাহা কিছু করি, ইহার আজ্ঞানুযায়ী হইলেই অত্যন্ত সুখপ্রদ হয়। ইহার অনভিমত হইলে, অনুতাপ হৃদয়কে স্তরে স্তরে পোড়াইয়া থাকে। সৎ অসৎ, ভাল মন্দ, এই শক্তি দ্বারাই উপলব্ধি হয়। বালককে—কেবলমাত্র স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে শিখিয়াছে, এরূপ বালককে—কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিতে হইলে এই পর্য্যন্ত বলিয়া দিলেই যথেষ্ট হয় যে, যাহা করিতে গেলে কে যেন অন্তরের ভিতর লুক্কায়িত থাকিয়া নিষেধ করিতে থাকে। যে কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেলে অনুতাপানলে হৃদয় দগ্ধ হইতে থাকে, সেই কার্য্যই অসৎ কার্য্য। যাহা ভাল না মন্দ, তুমি জান না, অথচ তোমার জানা আবশ্যক, ধীরে ধীরে অন্তরের নিকট জিজ্ঞাসা করিও, প্রকৃত উত্তর পাইবে। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিও, "দয়াবান, আমি ইহা বুঝিতে পারিলাম না, বুঝাইয়া দেও।" অনাবশ্যকীয় না হইলে দয়াবান হরি অবশ্য তোমার কথায় কাণ দিবেন। তখন যাহা বুঝিতে পাইবে, সহস্র নিউটন, সহস্র মিলের যুক্তি শক্তি তাহার নিকট হারি মানিবে। আমরা যখন কোন অন্যায় কার্য্য করি, আমাদের বিবেক শক্তি বড় কষ্ট পায়। যে এত উপকারী, যে এত শ্রদ্ধার জিনিষ, তাহাকে কি কষ্ট দিতে হয়?"

ইউরোপীয় কোন দার্শনিক পণ্ডিত বলিয়াছেন "The first step of life determines the destination of journey." জীবনের প্রথম পাদক্ষেপ গন্তব্য স্থান নির্দ্ধারণ করিয়া দেয়। গিরিজাপ্রসন্ন নূতন লেখক, তাঁহার সর্ব্ব প্রথম গ্রন্থের এই প্রবন্ধটী কি আভাষ দিতে সমর্থ নহে যে, তাহার ভবিষ্যৎ রচনাতেও আমরা অনেক সার তত্ত্ব লাভ করিতে পারিব? গিরিজাপ্রসন্নের স্ত্রীপাঠ্য গ্রন্থগুলি যেরূপ সারগর্ভ উপদেশপূর্ণ, তাহাতে স্পষ্টই ধারণা হয় যে, উহা দিগন্তগামী ঝটিকা-ভীত নাবিকগণের গগনস্থ ধ্রুব নক্ষত্রের ন্যায়, সংসার-রহস্যানভিজ্ঞ মায়া-মোহ বিজড়িত রমণীগণের সংসার-সমুদ্রের পথপ্রদর্শক।

কুসংসর্গ পরিত্যাগ।

কলিকাতা বাসকালে গিরিজাপ্রসন্ন ও তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা পাঁচজনের সঙ্গে ছাত্রাবাসে থাকিয়া কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তখন একজন ভৃত্য তাহাদের সঙ্গে বাস

করিত। সেরূপ ভাবে থাকা নিরাপদ নহে। উহাতে চরিত্রবান ও চরিত্রহীন উভয় প্রকার যুবকই একত্র বাস করিয়া থাকে। এ প্রকার আবাসে,অনেক স্থলে নিষ্কলঙ্ক যুবক দুষ্প্রাপ্য। যে পর্য্যন্ত জ্ঞান প্রস্ফুটিত হইয়া লোককে লক্ষ্যপথে গমনের সাহায্য না করে, ইন্দ্রিয়গণ মনের বশীভূত হইতে না চাহে, সে পর্য্যন্ত চরিত্রটী অপরের সতর্ক দৃষ্টির মধ্যে রক্ষিত না হইলে পতন অনিবার্য্য। গিরিজাপ্রসন্ন যে ছাত্রাবাসে থাকিতেন, তাহা "পূর্ব্ববঙ্গ-আবাস" নামে অভিহিত হইত। বলা বাহুল্য, পূর্ব্ববঙ্গের বালকগণের তত্ত্বাবধানেই এই আবাসটী গঠিত হইয়াছিল। গিরিজাপ্রসন্ন যে বাল্যকাল হইতে কেবলমাত্র হিন্দুধর্ম্মে অনুরক্ত ছিলেন,এমন নহে , হিন্দুদের আচার পালন ও খাদ্যাদির বিচার করিতেও যত্নশীল ছিলেন। ঐ পূর্ব্ববঙ্গ আবাসের অধিকাংশ লোক,ধর্ম্মবিগর্হিত নানারূপ কার্য্য ও কেবল মাত্র রসনার তৃপ্তির জন্য নানা শ্রেণীর হিন্দুর অখাদ্য আহার করিতেন। গিরিজাপ্রসন্ন উহাদের ঘৃণিত ব্যবহার দর্শন করিয়া বাক্যালাপ,এমন কি,উহাদের সঙ্গে একত্রে ভোজন করিতে অসম্মত হইলেন। গিরিজাপ্রসন্নের এরূপ আচরণে ঐ দুরাচারগণ ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল। গিরিজাপ্রসন্ন উহাদের সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া, অনতিবিলম্বে ঐ স্থান পরিত্যাগ করিলেন, এবং পৃথক বাসা ভাড়া করিয়া পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন।

অসৎ সংসর্গে পড়িয়া, অনেকে ঠেকিয়া, দুই একটী পাপ কার্য্যে বশ্যতা স্বীকার করিয়া থাকেন। ঐরূপ কার্য্যের কেহ প্রতিবাদ করিলে বলিয়া থাকেন—"ভবিষ্যতে বিবেক ধ্বনির অসম্মান করিয়া আর ঐরূপ কার্য্যের প্রশ্রয় দিব না।" পাপাচারণ করিব না, আর পাপাচরণ করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সতর্কিত হইব, এই এই দুইটী সংকল্পের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। যেরূপ বারিপূর্ণ কুম্ভের তলদেশ কোন কারণে ছিদ্র হইলে, সেই ছিদ্র দ্বারা—অনায়াসে বারি রাশি বিনির্গত হইয়া কুম্ভটীকে বারিশূন্য করিয়া ফেলে ;সেইরূপ, চরিত্রের কোন অংশ পাপ স্পৃষ্ট হইলে চরিত্রটীকেও হীন ও কলঙ্কিত করিয়া ফেলিতে পারে। এ সংসারে শ্রেষ্ঠাসন অধিকার করিতে হইলে "সর্ব্বদা নিষ্কলঙ্ক জীবন যাপন করিব" এরূপ একটা ধনুর্ভঙ্গ পণ থাকা চাই। গিরিজাপ্রসন্ন এইরূপ একটা পণ হৃদয়ের মধ্যে দৃঢ় করিতেছিলেন। ঘোড় দৌড়ের সময় যেমন দুই একটা বেগবান অশ্ব দূর হইতে বেড়া দৃষ্টি করিয়া উহা উল্লম্ফনের জন্য দ্বিগুণ বেগে ধাবিত হয়, তেমন, গিরিজাপ্রসন্নের পণ রক্ষার পথ কণ্টকিত হইলে, তাঁহার লক্ষ্য বস্তুর প্রতি শ্রদ্ধা সহস্র গুণ স্ফুটতর হইতে থাকিত। সাধু ও নির্ম্মল ভাবে জীবন যাপনের পথ কুসুম কোমল নহে। এপথ-পর্য্যটনের জন্য সাধনা সম্বল চাই। গিরিজাপ্রসন্ন পাঠ্য-জীবনেই এই পথ ভ্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। তাঁহার প্রাণপণ সাধনার ফলে সে আশা কতকটা পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

সঙ্গীত-প্রিয়তা।

গিরিজাপ্রসন্ন সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। যদিও তিনি সুকণ্ঠ ছিলেন না, তথাপিও তিনি সঙ্গীত-বোদ্ধা ছিলেন। তিনি সুস্বর হারমোনিয়ম বাদন করিতে জানিতেন। তাঁহার সঙ্গীতপ্রিয়তার ফলে,"গৃহলক্ষ্মী" প্রথম ভাগের প্রথম সংস্করণে, আমরা সঙ্গীত শীর্ষক একটী প্রবন্ধ দেখিতে পাই। উহা অবশেষে "সাধারণীর" পরামর্শানুসারে অন্যান্য সংস্করণে পরি-

ত্যক্ত হইয়াছিল। একবার তাহার বাটীতে দূরবর্ত্তীস্থানের একজন উচ্চ অঙ্গের গায়ক আসিয়াছিল, গায়ক সঙ্গীত আরম্ভ করিলে, অনেক বাদক তাহার সঙ্গে সঙ্গত করিয়া পরাজিত হওয়ায়, শ্রোতাগণের অনেকে বাদ্যবিহীন সঙ্গীত শ্রবণেই ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছিল। গিরিজাপ্রসন্ন সেইস্থলে উপস্থিত হইয়া বলিলেন "সঙ্গীতের সঙ্গে বাদ্য না হইলে গায়কের গীতপটুতা উপলব্ধি করা কষ্টকর।" গিরিজাপ্রসন্নের নিকট কেহ কোন গুণের পরিচয় দিতে আসিলে, তিনি সাধ্যানুসারে গুণগ্রহণ করিতে উৎসাহী হইতেন। এজন্য গুণীব্যক্তি তাহার গুণগ্রহণের ক্ষমতার স্ফূর্ত্তিতে মোহিত না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। সঙ্গীতপ্রিয় অনেক লোক স্বভাবের বিচার না করিয়া প্রতিভাশালী গায়কের অমৃত মধুর সঙ্গীত শ্রবণে আগ্রহান্বিত হইয়া থাকেন। গিরিজাপ্রসন্নের সঙ্গীতে আনুরক্তি ছিল বলিয়া তিনি চরিত্রহীন গায়কের ভাববিহীন সঙ্গীত শ্রবণে উৎসাহান্বিত হইতেন না। যে সঙ্গীতের মধুর স্বর হৃদয়ের অজ্ঞাত প্রদেশে প্রবেশ করিয়া হৃদয়তন্ত্রী বাজাইয়া মনকে ভাবাবিষ্ট করিতে সমর্থ, গিরিজাপ্রসন্ন তাদৃশ সঙ্গীত শ্রবণেই উল্লাসিত হইতেন।

পাঠ্যজীবনে তিনি সঙ্গীতবিষয়ক একটী ভাবময়ী কবিতা লিখিয়াছিলেন, আমরা এস্থলে উহা উদ্ধৃত করিলাম।

সঙ্গীত।

(১)

কেন এ বিরহ-গীত গাহিয়ে বেড়াও তুমি
স্বরগ-সম্ভব,
পরের দুঃখেতে ভুলি, দাও কি হৃদয় খুলি,
জুড়াইতে অভাগার তাপিত অন্তর ?
(সম দুঃখে-প্রপীড়িত সদাই কাতর)।

(২)

কোমল শরীর তব পড়েছে ঢলিয়ে
দেখি পর দুঃখ,
তাই কি অমন করি, বলিতেছ ধীরি ধীরি
বিষাদের অফুটন্ত মধুর ভাষায়,
"সদা কাঁদে পোড়া মন তোদের ব্যথায়।"

(৩)

অশ্রুজল জমাইয়ে গড়িলা কি তব
নিরমল চিত,
দুঃখের কিরণ গায়, লাগিলে গলিয়া যায়,
সরল স্ফটিকরাজি স্বচ্ছ সরোবর,
গলাইতে বিষাদের মুরতি সুন্দর।

(৪)

তাই কি নিরাশ্বাসে গায় যদি লাগে তব
সলিলের রাশি,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা, করি কি মধুর খেলা,
এ উহার গায়ে ঢলি ভাসি এ বেলায়,
পরের দুঃখেতে সদা অস্থির হৃদয়।

(৫)

সংসারের দুঃখ দেখি চাহ কি ফিরিতে তুমি
আপন আলয়,
তাই কি ও বিষাদ স্বর, ক্রমে ক্ষীণ কলেবর,
মিলায় আপন তনু আকাশের গায়—
যাইতে সে সুখ স্থানে নিবাস যথায়।

(৬)

শুনিয়াছি সত্ত্বগুণে তমোগুণ যবে
করয় প্রবেশ,
বাড়বানলের প্রায়, সে বড় ভীষণ হয়,
জগতের রীতি এই—গুণের স্বভাব
দ্বিগুণিত করি যেন পূরায় অভাব।

(৭)

তাই কি ও ভীম দেহে এত শক্তি ধর,
উপহাসি বজ্রস্বরে ন্যায়ের পতাকা ধরে,
আশু হও কাঁপাইয়ে বৈরীর অন্তর
তুচ্ছ করি মৃত্যুভয় স্থির কলেবর।

(৮)

দুইটী তোমার ভাব লাগে বড় মোর
প্রাণস্নিগ্ধকর—
দুঃখী পর দুঃখে যবে, আশ্বাসিতে পরজীবে
আবাহন কর তুমি স্বরগের স্বর,
শীতলিতে নিরাশার দগ্ধ কলেবর।

(৯)

শুনি ও বিষাদ মাখা সুমধুর স্বর তব
মোহে এ পরাণ,
আপনা ভুলিয়ে যায়, তোমাতে মিশাতে চায়—
তাই করি মোহ জ্ঞান-বিমুগ্ধ অন্তর,
এতই মোহন মন্ত্র জান যাদুকর।

(১০)

শুনি সেই প্রণয়ের আলাপ তোমার
শ্রবণ-তোষণ,
উদাস হইয়ে যাই, সংসার ভুলিতে চাই,
জড়বৎ সুখনীরে করি সন্তরণ,
সাগর-বক্ষেতে ক্ষুদ্র তরণী যেমন।

(১১)

কেমনে যে শূন্য হয়ে পড়ে এহৃদয়
কেমনে বলিব,
তোমার স্বরের সনে, বেড়ায় আনন্দ মনে,
শূন্য মনে শূন্য হয়ে পাগল হৃদয়
করি জীবনের কাজ শুধু স্বরময়।

(১২)

পূর্বের সুখস্মৃতি উঠয় জাগিয়া
প্রাণ-বিমোহন,
প্রিয়জন প্রেম কথা—জানিনা কি সূত্রে গাঁথা,
তোমার স্বরের সনে সুখের জীবন
এদেরো কি উপাদান তোমার যেমন।

(১৩)

আরো এক ভাব তব চির সহচর—
অভিন্ন হৃদয়,
যেখানে তোমায় দেখি, জুড়ায় হৃদয় আঁখি,
দেখিবারে পাই সদা ভকতি তথায়
প্রশান্ত গম্ভীর বেশ চিত প্রেমময়।

(১৪)

বেশি কি বলিব আর যা কিছু যথায়
আছে প্রেমময়,
কোমল মুখেতে মাখা ধরম হৃদয়ে আঁকা,
সে সকলি তবাধীন রাজ রাজেশ্বর,
কাহার রাজত্ব এত মনের উপর?"

গৃহলক্ষ্মী প্রথম ভাগ।

গিরিজাপ্রসন্ন প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এফ-এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েন। তিনি বড়ই অধ্যবসায়শীল ছাত্র ছিলেন। তাঁহার পাঠ্যাবস্থার কথা যেরূপ প্রকাশ, তাহাতে বোধ হয়, তিনি বৃথা সময় ক্ষেপণ অধর্ম্ম মনে করিতেন। কলেজের পড়া শেষ করিয়া যে সময়টুকু বাঁচাইতে পারিতেন, সে সময়টুকু তিনি মাতৃভাষার সেবায় ব্যয় করিতেন। অনেক লাইব্রেরী হইতে পুস্তক আনিয়া গৃহে বসিয়া পাঠ করিতেন। গিরিজাপ্রসন্নের পিতা বিদ্যানুরাগী ছিলেন, কাজেই বিদ্যার্জ্জন জন্য গিরিজাপ্রসন্নকে কোন দিন অর্থের অভাব অনুভব করিতে হয় নাই। তিনি এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে বি-এ অধ্যয়ন করেন। এই সময় তাহার শ্রেষ্ঠ স্ত্রীপাঠ্য গ্রন্থ গৃহলক্ষ্মী প্রকাশিত হয়। একে বি এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া বিশেষ শ্রম-সাপেক্ষ, তৎপর আবার গৃহলক্ষ্মীর ন্যায় একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন। বিশেষ অধ্যবসায় ও প্রতিভা না থাকিলে কি এই দুরূহ দুইটী কার্য্য এক সময় নিষ্পন্ন হয়! "গৃহলক্ষ্মী" প্রকাশের পরই তিনি বঙ্গসাহিত্য-সমাজে একজন উৎকৃষ্ট লেখক বলিয়া সাহিত্যসেবাদের নিকট আদরণীয় হইতে লাগিলেন। গৃহলক্ষ্মীর পরিচয় আর আমরা নূতন কি দিব? ইহা নিজগুণে বঙ্গের ঘরে ঘরে বঙ্গনারী কর্ত্তৃক আদৃত হইতেছে। এই গ্রন্থখানির সৃষ্টি বিবরণ সম্বন্ধে গ্রন্থকার যাহা বলিয়া গিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

"অনেক দিন হইল, একদিন বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীর সত্ত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে স্বামী ও স্ত্রীর কথোপকথনচ্ছলে উপদেশ সম্বলিত একখানি স্ত্রীপাঠ্য গ্রন্থ লিখিতে অনুরোধ করেন। বিশেষ কোন কারণবশতঃ আমি সেই কার্য্যের ভার শ্রীযুক্ত হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর ন্যস্ত করি। হরিদাস বাবু

তদনুযায়ী একখানি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন, ঐ পাণ্ডুলিপির অনুযায়ী নামকরণ হয়। প্রথম তিন ফর্ম্মায়—"স্বামী স্ত্রী" "লেখা পড়া" "বেশভূষা" "শ্বশুর ঘর" এই কয়েটী প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। যখন হরিদাস বাবুর সহিত পুস্তক প্রকাশের সম্বন্ধ রহিত হইয়া গেল, তখন আমিই পুস্তক প্রকাশে ইচ্ছুক ও বাধ্য হইয়া পুস্তকখানির অবশিষ্টাংশ সঙ্কলন ও প্রণয়ন করিলাম। হরিদাস বাবুর পাণ্ডুলিপি হইতে সঙ্কলন—অবশ্য হরিদাস বাবুর মত লইয়াই করিয়াছিলাম। এইরূপ "গৃহলক্ষ্মী" কতক হরিদাস বাবুর, অবশিষ্ট আমার লেখা লইয়া, তিন ফর্ম্মা তাঁহার সম্পাদকতায়, অবশিষ্ট আমার তত্ত্বাবধানে ও সম্পাদকতায় প্রকাশিত হইল।"

"যখন পুস্তকের দায়িত্ব আমার হইল, তখন পুস্তকের অন্যান্য যে সকল লেখা হরিদাস বাবুর ছিল, তাহাও আবশ্যক মতে আমার মতানুযায়ী করিয়া পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে বাধ্য হইলাম।"

রমণীগণকে গৃহস্থাশ্রমের যাবতীয় কার্য্য শিক্ষা প্রদানই গৃহলক্ষ্মীর উদ্দেশ্য। গৃহলক্ষ্মী দ্বারা এ উদ্দেশ্য আশানুরূপ রক্ষিত হইতেছে। এই পুস্তক খানির একটী প্রধান গুণ, গ্রন্থকার কেবল শাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়াই উপদেশ প্রদান করেন নাই। শাস্ত্রীয় অনুশাসনের সঙ্গে যুক্তি প্রদান করিয়া, অনেক স্থলে, কঠিন বিষয়গুলির মীমাংসা করিয়াছেন। এই জন্য গৃহলক্ষ্মী পাঠ করিয়া শাস্ত্রীয় অনুশাসন গুলি পাঠকবর্গের যুক্তিপূর্ণ বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি জন্মে এবং উহা পালনেও মন উত্তেজিত হয়।

গৃহলক্ষ্মীর উপদেশগুলি জাতীয় ভাবের উদ্দীপক, ও হিন্দুধর্ম্মে ভক্তি স্থাপনের পরিপোষক। এই দ্বিতীয় গ্রন্থখানি কিরূপ পাণ্ডিত্যের সহিত লিখিত হইয়াছে, গ্রন্থকার এই পুস্তক খানিতে কিরূপ রচনা-কৌশল ও সংসার-ধর্ম্মাভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা দেখাইবার জন্য স্বামী ও স্ত্রী শীর্ষক প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

"এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মর্ম্মাহত হইতেছি, কাহার দিকেই বা তাকাই। সমাজে যাহারা শিক্ষিতা বলিয়া খ্যাতা, তাঁহারা ত ভালবাসার অধিকার লইয়াই ব্যস্ত, তাঁহারা কি আর ইহধর্ম্মে সহধর্ম্মিণী হইতে চাহিবেন? ঘরকন্না তাঁহাদের নিকট অতি ক্ষুদ্র কার্য্য। ইহা ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত নহেই, প্রত্যুত অতি ঘৃণাজনক হীন কার্য্য বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। তাঁহারা চাহেন, উচ্চ বিষয়ের দিকে—রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি বড় বড় কার্য্য লইয়াই তাঁহারা ব্যস্ত, তাঁহারা কি ঘরকন্নার কথা ভাবিতে পারেন? আর যাঁহারা অশিক্ষিতা, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে ঘরকন্না করেন বটে, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহা একটী অতি পবিত্র কর্ত্তব্য ও ধর্ম্মানুষ্ঠান ভাবিয়া নহে—না করিলে চলেনা বলিয়া। যেমন উপাসনা, যেমন পূজা, যেমন ব্রত, যেমন যজ্ঞ, তেমনই যে ঘরকন্না, একথা তাঁহারা জানেনই না। তাই এখন আর আমাদিগের গৃহস্থাশ্রম নাই। আছে যাহা, তাহা আহার বিহারের নির্দ্দিষ্ট স্থান মাত্র। গৃহস্থাশ্রমে এখন সহধর্ম্মিণী নাই—আছে প্রণয়িনী মাত্র।"

"তাই আমাদের বড়ই ইচ্ছা হয়, এই হিন্দু পত্নীগণকে আবার সেই গৃহধর্ম্মে সহধর্ম্মিণী পদে প্রতিষ্ঠিত দেখিব। ঘরকন্না যে একটী বিশেষ ধর্ম্মানুষ্ঠান, তাহা বুঝিয়া যদি শিক্ষিতা কামিনীগণ সহধর্ম্মিণীর ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তবে আমাদিগের আবার এই গৃহস্থাশ্রমে চতুর্ব্বর্গের ফল পাইতে পারি। হায়, কবে এই আশা সফল হইবে? কবে হিন্দুরমণী আবার সেই সহধর্ম্মিণীর পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, প্রফুল্লের ন্যায় স্বামীর ছোট বড় সকল অনুষ্ঠানে সহায়তা করিয়া, আপনাকে কৃতার্থ মনে করিবেন? এমন দিন কি হইবে?"